নোটবুক সিরিজ - ২

গ্রন্থ পর্যালোচনা

ইবনে খালদুনের দ্য মুকাদ্দিমা

হোসাইন আহমদ

গ্রন্থ পর্যালোচনা

ইবনে খালদুন এর “দ্য মুকাদ্দিমা”

হোসাইন আহমদ

আহরার পাবলিশার্স

নোটবুক সিরিজ-২

ইবনে খালদুন এর “দ্য মুকাদ্দিমা”
IBN KHALDUN ER THE MUQADDIMAH

গ্রন্থ পর্যালোচনা : **হোসাইন আহমদ**

স্বত্ব : **সর্বস্বত্ব লেখকের। কোনরূপ পরিবর্তন, পরিমার্জন ছাড়া যে কেউ কপি করতে পারবেন।**

মুদ্রণ : **আহরার পাবলিশার্স**

প্রকাশ: **মে, ২০২২, কায়রো, মিসর।**

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : **মো: সালমান খান**

আহরার পাবলিশার্স

প্রকাশক : **আহরার পাবলিশার্স**
editor.ahrarpublishers@gmail.com
WhatsApp: +447840086856

মূল্য:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه

আবু জায়েদ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন খালদুন (মৃত্যু ৮০৮ হিজরি)। চতুর্দশ শতকের প্রখ্যাত আলেম ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের কালজয়ী এক গ্রন্থের নাম মুকাদ্দিমাহ। মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে যা সর্বমহলে সমাদৃত। ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের ভিত্তিমূলক রচনা করে গেছেন। তাছাড়া রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন ইত্যাদী বিষয়ে তার থিওরী মৌলিক পাঠ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যে। ষাটের দশকে ফ্রাঞ্জ রোজেন্থাল মুকাদ্দিমাহ গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। এরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বের করে প্রিন্সটন এন্ড অক্সফোর্ড পাবলিকেশন্স।

এই বইটির অবস্থান বিবেচনায় আমার মত একজন ব্যক্তির সেটাকে সমালোচনা করা চিন্তার বাইরের কাজ।

কিন্তু আমি বরাবরের মতো এই বইটিও পড়ার সময়েও কিছু নোট নিতে থাকি। এবং সেগুলোকেই পাঠকের সাথে শেয়ার করার তাগিত অনুভব করি।

এই প্রচেষ্ঠায় পাঠকের কাছে কোন প্রকারের ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, আমাদেরকে অবগত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তীতে তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্ঠাকে কবুল করুন। আমীন।

মা'আস-সালাম

হোসাইন আহমদ

ইবনে খালদুন আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত কিছু ধারণা দিয়েছেন, তিনি এই বইয়ে কী আলোচনা করতে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, এই বইয়ে আমরা সভ্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করবো। যা মানবজাতিকে তাদের সমাজবদ্ধতায় বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন রাজকীয় কর্তৃত্ব, পেশা, বিজ্ঞান এবং কারুশিল্প ইত্যাদি। বিভিন্ন যুক্তির আলোকে তা পর্যালোচনা করা হবে, যা অভিজাত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যকার চিন্তা ও জ্ঞানের বৈচিত্র, পার্থক্য এবং প্রকৃতি কী সেটা পরিস্কার করে দেবে। বিভ্রান্তি ও সন্দেহ দূর করবে।

মানুষ তার কাছে থাকা বিশেষ কিছু গুণাবলির দ্বারা অন্য প্রাণী থেকে পৃথক হয়ে থাকে। যেমন-

(১) বিজ্ঞান এবং শিল্প যা চিন্তা করার ক্ষমতা থেকে আসে। যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে। এবং এই চিন্তাভাবনা করার সক্ষমতার কারণেই সে সমস্ত প্রাণীর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান হয়।

(২) প্রভাব, প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও সংযমের প্রয়োজনীতা। যেহেতু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শুধুমাত্র মানুষই এসব ছাড়া অস্তিত্বমান থাকতে পারে না।

(৩) জীবনযাপনের জন্য মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা। এবং বিভিন্ন উপায়ে জীবনের উপায়-উপকরণ অর্জনের ব্যাপারে তার উদ্বেগ। বেঁচে থাকার জন্য খাবারের যে প্রয়োজনীয়তা সেটার জন্য তা হয়ে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লাই তার মধ্যে কামনা ও জীবিকা খোঁজার ইচ্ছা তৈরি করে দিয়েছেন।

“He gave everything its natural characteriscs, and then guided it.”

قال ربنا الذى أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدىٰ

“আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার সৃষ্টি আকৃতি দান করেছেন, তারপর পথনির্দেশ করেছেন। (সূরা ত্বোহা-৫০)

(৪) সভ্যতা। অর্থাৎ মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য, মানসিক প্রয়োজন ও একত্রে বসবাসের চাহিদার জন্য শহরগুলোতে এবং জনপদে একত্রে বসতি স্থাপন করতে হয়। কারণ মানুষ প্রকৃতগতভাবেই কো-অপারেটিভ। আর সভ্যতা দুই ধরনের হয়ে থাকে। মরুভূমি (বেদুইন) সভ্যতা। এসব সভ্যতা দেখা যায় প্রত্যন্ত ও পল্লী অঞ্চলে, পাহাড়-পর্বতে, বালুময় মরুভূমির প্রান্তে। sedentary (অলস) সভ্যতা। যা দেখা যায় শহরে, গ্রামে বা এমন সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে, যেগুলো প্রাচীরের মধ্যে নিজেদের আটকে রেখে এর সাহায্যে নিজেদের সুরক্ষা দিয়ে থাকে। এই ভিন্ন অবস্থা সভ্যতা ও মানুষের আচরণে ভিন্নতা নিয়ে আসে।

এ বিষয় নিয়ে ইবনে খালদুন ৬টি অধ্যায়ের আলোকে এই বইয়ে আলোচনা করেছেন।

(১) মানবসভ্যতা নিয়ে সাধারণ আলোচনা।

(২) মরুভূমির সভ্যতা

(৩) রাজবংশ, খেলাফত এবং রাষ্ট্রীয়- যেমন সরকারি পদ-পদবী নিয়ে আলোচনা।

(৪) Sedentary বা আয়েশি সভ্যতা। শহর, নগর।

(৫) শিল্প, জীবিকা নির্বাহের উপায়, পেশা এবং এর বিভিন্ন দিক।

(৬) বিজ্ঞান ও এর অধ্যয়ন।

ইবনে খালদুন লিখেছেন, আমি প্রথমে মরুভূমির সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছি। কারণ এটি অন্য সমস্ত কিছুর আগে আসে। পরবর্তী আলোচনায় যা স্পষ্ট হয়ে যাবে। একই কারণে শহর ও নগরের আলোচনার পূর্বে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আলোচনার স্থান দিয়েছি। বিজ্ঞানের আলোচনার আগে জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। কারণ জীবিকা নির্বাহ করা প্রয়োজনীয় এবং প্রাকৃতিক। অন্যদিকে বিজ্ঞানের অধ্যয়ন একটি বিলাসিতা বা স্বাচ্ছন্দ্যতা। আর প্রাকৃতিক যে কোনও কিছুই বিলাসিতার চেয়ে প্রাধান্য পায়।

সূচিপত্র

ইতিহাস বলার আগে এর ক্রিটিক্যাল পর্যালোচনা জরুরি ৮
সময় ও পাত্র ভেদে একই টাইটেলের ভিন্ন প্রভাব থাকে ১১
অপ্রয়োজনীয় সিলেবাসে শিক্ষাদান ১৫
করোনা ভাইরাস; ব্ল্যাক ডেথ! ১৮
সহযোগিতার মানসিকতা সাফল্যের চাবিকাঠি ২৩
উপকরণ গ্রহণ না করা সুন্নাহ বিরোধী ২৪
প্রতিটি আইনের নির্দিষ্ট মাকসাদ থাকে ২৬
অন্যায় সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে ২৭
রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব মানুষের একটি প্রকৃতিক গুণ ২৯
প্রাচুর্যতা দ্বীন পালনকে বাধাগ্রস্ত করে ৩১
গ্রামের লোকেরা শহরের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন ৩৫
আইনের উপর নির্ভরতা মনোবল ধ্বংস করে দেয় ৪০
নেতৃত্বের যোগ্যতা। নেতার ছেলেকে নেতা বানানো ভুল সিদ্ধান্ত। ৪৩
পরাজিতরা অনুসারী হয়, অনুসরনীয় হয় না ৪৯
কৌশলী বিপ্লব ৫১
সভ্যতার পরবর্তনকারীদের অবস্থা ৫৩
রাজত্বের সময়কাল ৫৭
শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্ঠা না করা, খারেজী চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত ৫৯
তলোয়ার ও কলমের গুরুত্বের ভিন্নতা ৬২
যে ভিন্ন একটি নিদিষ্ট এজেন্ডার জন্য কাজ করে, সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৬৪
মনস্তাত্ত্বিক কারণ, যুদ্ধ জয়ের মূল উপাদান ৬৫
মানবসভ্যতার সংঘবদ্ধ পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব জরুরি ৬৮
শহরের অলস বাসিন্দারা সভ্যতাকে কলুষিত করে ৬৯
যার চরিত্র দূষিত, ভাল বংশ পরিচয় তার কোন কাজে আসে না ৭১
আত্মা শ্রেষ্ঠত্য ও আধিপত্য খুঁজে বেড়ায় ৭৩
একজনের অর্জনে অন্যজন বঞ্চিত হয় ৭৪
মানুষ পূর্বপুরুষদের নয়, রীতিনীতির গোলাম ৭৫
একই সাথে যোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারী প্রায় অস্তিত্বহীন ৭৬
পদবীধারী লোক দ্রুত সম্পত্তির মালিক হন। ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভ করেন ৭৮
নিজেকে পারফেক্ট ভাবা একটি দোষারূপযোগ্য গুণ ৭৯

ইতিহাস বলার আগে এর ক্রিটিক্যাল পর্যালোচনা জরুরি

খলীফা হারুনুর রশীদের সময়কালে পারস্যের বারামিকাহ পরিবার ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তবে একসময় হারুনুর রশীদ তাদের বিরুদ্ধে ক্রাকডাউন শুরু করেন। কেন ক্রাকডাউন করা হলো? এবং এর পেছনের কারণ কী ছিল? সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে কিছু ঐতিহাসিক একটি গল্পের অবতারণা করেছেন। খলিফা হারুনুর রশীদের বোন ছিলেন আব্বাসা। খলিফা হারুনুর রশীদ নাকি আব্বাসা এবং তার মন্ত্রী জফর ইবনে ইয়াহইয়াকে নিয়ে একসাথে মদ পান করতেন। এই জাফর ইবনে ইয়াহইয়া ছিলেন একজন বারামিকাহ। খলিফা ভাবলেন তার বোন ও জাফরকে একসাথে দেখে হয়তো অনেকেই সমালোচনা করবে। তাই তিনি তাদেরকে লোক দেখানো বিয়ের অনুমতি দেন। কিন্তু এক সময় আব্বাসা কৌশল করে জাফরের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেন, আসতাগফিরুল্লাহ। যার কারণে হারুনুর রশীদ অগ্নিশর্মা হয়ে পুরো বারামিকাহদের ধ্বংস করে দেন। এবং তাদের বিরুদ্ধে ক্রাকডাউন শুরু করেন।

যে কোনো বুদ্ধিমান লোকই যদি সবদিক পর্যালোচনা করেন, তাহলে আব্বাসাকে নিয়ে গল্পটির সত্যতা নিয়ে সন্দিহান হবেন। আব্বাসা সে সময়কালের একজন উচ্চ বংশীয় মহিয়সী নারী ছিলেন। যিনি একাধারে একজন মহান খলিফার মেয়ে এবং আরেকজন মহান খলিফার বোন। অত্যন্ত সম্মান ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন তিনি। এছাড়া তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত একজন তাফসিরকারকের বংশধর। তাঁর পক্ষে এরকম কাজ সম্ভবপর নয়। এটা একটা জঘন্য ও অবিশ্বাস্য কাহিনী যা কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতো উচ্চ পদমর্যাদার একজন নারীকে তাঁর পরিবার তাঁর থেকে নিম্ন পদমর্যাদার একজন লোকের সাথে নামকাওয়াস্তে বিয়ে দেবেন সেটাও বোধগম্য নয়। আব্বাসার মতো এমন একজন বিদূষী মহিলার এরকম আচরণের কোনো যৌক্তিকতাই মিলবে না। তাছাড়া হারুনুর রশীদের মতো একজন ধর্মপরায়ণ খলিফা তাঁর বোনকে নিয়ে আরেকজনের সাথে মদপান করবেন, এটাও হাস্যকর, মিথ্যা ও আজগুবি কাহিনী বলেই প্রতীয়মান হয়। হারুনুর রশীদ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ খলিফা। একবার তিনি আবু নুয়াস নামক একজন প্রখ্যাত কবিকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্দি করে রাখার জন্য বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তওবা করে মদপান ছেড়ে দেবেন। তাহলে কীভাবে সম্ভব? হারুনুর রশীদের মতো একজন খলিফার পক্ষে এই হীন কাজ করা। অথচ ইতিহাসকে যাচাই করলে দেখা যায়, বারামিকাহদের অত্যাধিক ক্ষমতা অর্জনই ছিল তাদের এই ধ্বংসের কারণ। পুরো রাজত্বের ক্ষমতা এবং রাজত্ব ও রাজস্বের চাবিকাঠি তারা তাদের হাতে নিয়ে নেয়। একপর্যায়ে এমন অবস্থা তৈরি হয় যে, খলিফার হাতে কোনো ক্ষমতাই বাকি থাকেনি। খলিফা ক্ষমতার ব্যবহার করতে চান, কিন্তু সেটা করতে পারছেন না বারামিকাহদের জন্য। এটাই হলো ইতিহাসের বাস্তবতা। এবং এই কারণেই খলিফা হারুনুর রশীদ বারামিকাহদের বিরুদ্ধে ক্রাকডাউন

শুরু করেছিলেন।

আসলে ইতিহাসে এমন অনেক কল্পকাহিনী লেখা আছে যার কোনো ভিত্তিই নেই। ইবনে খালদুন তাই বলেছেন, ইতিহাস লিখতে এবং বলতে ভিন্ন ভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য আহরণ জরুরি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অগাধ জ্ঞানও রাখা চাই। তাছাড়া যাচাই-বাছাই করার মত মন মানসিকতা থাকতে হবে। আরও থাকতে হবে তেজস্বী অনুমান ও তীক্ষ্ণ ধারণাশক্তি। তিনি বলেন:

> "If he trust historical Information in its plain transmitted form and has no clear knowledge of the principal resulting form custom the fundamental facts of politics the nature of civilization or the conditions governing human social organisation he often cannot avoid stumbling and sleeping and deviating form the path of the truth."

যে কোনো তথ্য যাচাই-বাছাই না করে যদি যেভাবে এসেছে ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করে তা বর্ণনা করে দেয়া হয়, তাহলে এখানে ভুলের সম্ভাবনা থাকবে। ঘটনা সংঘটনের সময়কালের প্রথা, রাজনৈতিক বাস্তবতা ও সংস্কৃতি বিবেচনায় না আনলে নিশ্চিত ভুল হবে। সভ্যতার প্রকৃতি জানা না থাকলে ভুল অনিবার্য ভাবেই হবে।

বর্তমানে আমাদের চোখের সামনেই আমরা দেখি কত শত ঘটনা ঘটছে। এবং তার উপর মানুষের মনগড়া বিশ্বাসও আমরা দেখতে পাই। বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা না থাকায় অনেকেই প্রোপাগান্ডা, কন্সপাইরেসি বিশ্বাস করে বসে আছেন। মিলিটারি হিস্ট্রি ও এর ইভোলিউশন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় কত ভুল তথ্য এবং ন্যারেটিভ বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে হিসেব কষলে এর কূল-কিনারা পাওয়া মুশকিল। একটি উদাহরণ দেখা যাক,

গত ১১ জুলাই ২০২০, আল-জাজিরার ইংরেজি চ্যানেলে আফগান তালেবান নেতা খায়রুল্লাহ খায়েরখাহের একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়। ভিডিওটির শুরুতেই সঞ্চালক বলেন:

"Once backed by United States CIA the Taliban ruled most of Afghanistan." আল-জাজিরা একটি প্রেস্টিজিয়াস চ্যানেল। আল-জাজিরার মতো চ্যানেল যখন দাবি করবে যে, তালেবানকে আমেরিকার সিআইএ সাহায্য করেছে, তখন অনেকেই এটা যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করবেন না। তাছাড়া বর্তমানে একটি জনপ্রিয় ধারণা হলো আমেরিকা আফগান আরব গেরিলাদের ট্রেনিং দিয়েছে, আল-কায়েদা তৈরি করেছে, এবং পরবর্তীতে আল-কায়েদা আমেরিকার বিরুদ্ধে চলে যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই ব্যাপারে আল-জাজিরার বর্ণনা এবং বর্তমানকালের যে ধারণা, দুটোই মিথ্যা ও প্রমাণহীন। তালেবান তো অনেক পরে তৈরি হয়েছে। এর পূর্বে মুজাহিদীন ও আফগান আরবদের আমেরিকা সরাসরি সাহায্য করেছে এমন কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। সিআইএ ও আফগান আরবদের যোগসাজশের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিন দশক অতিবাহিত হয়ে গেছে আফগান যুদ্ধের। কিন্তু এখনও কোনো সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ প্রকাশিত হয় নি এই ভিত্তিহীন ধারণার সমর্থনে। আশির দশকে আফগানিস্তানে কাজ করা তিনজন সিআইএ অফিসারের দুইজনই বলেছেন তারা আফগান আরবদের নিয়ে কোনো কাজ করেননি। এবং সৌদি জি আই ডি কর্মকর্তা আহমেদ বাদিব বলেছেন, আফগান যুদ্ধের সময় আমেরিকানদের সেবামূলক কাজ থেকে দূরে রাখা হতো। কারণ মুজাহিদীনরা পাশ্চাত্য কাফেরদের সাথে সরাসরি কোনো যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে

নেতিবাচক ছিলেন। এ নিয়ে তারা প্রতিবাদও করেছিলেন। এছাড়া পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস আই এস আইয়ের তখনকার আফগান ব্যুরো প্রধান লিখেছেন: "একটি মিথ্যা যা সোভিয়েত প্রোপাগান্ডার আলোকে অনেক সাংবাদিকের তৈরি, সেটার ব্যাপারে বলতে চাই, কোনো আমেরিকান বা চাইনিজ মুজাহিদদের ট্রেনিং বা অস্ত্র সরবরাহে জড়িত ছিল না।"

অন্যদিকে আফগান মুজাহিদীনদের অন্যতম একজন নেতা, হেকমতিয়ার বলেছিলেন: "আমরা আমেরিকার কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেইনি। এবং আমাদের মধ্যে কোনো লিংকও ছিল না।"

আসলে সকল পক্ষের বর্ণনা যদি আমরা যাচাই করি এবং ক্রিটিকালি অনুসন্ধান চালাই, তাহলে ফলাফলে ইবনে খালদুনের কথারই সতর্কতা মিলে।

"they strayed from the truth and found themselves lost in the desert of baseless assumption and errors"

অর্থাৎ তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং ভ্রান্তি ও অপ্রমাণিত ভিত্তিহীনতার মরুভূমিতে পথ হারিয়েছেন। এজন্য ইবনে খালদুন বলেছেন ইতিহাস প্রচার করা এবং লেখার আগে ইতিহাসের ক্রিটিক্যাল ইনভেস্টিগেশন জরুরি।

এইসব ভিত্তিহীন তথ্য ইতিহাসে জড়ানোর কারণ বর্ণনায় ইবনে খালদুন উল্লেখ করেন যে,

> "there are many such stories they are always creeping up in the works of the historians. The incentive for inventing and reporting them shows a tendency to Forbidden pleasure and for smearing the reputation of others. People justofy their own subservience to Plesure by citing the suppose doing of men and women of the past. therefore they often appear very eager for such information and are alart to find it when they go through the pages of published works."

আপনারা ইতিহাসের বইয়ে এমন অনেক আজগুবি কাহিনীর বর্ণনা দেখতে পাবেন। এসকল বর্ণনা এবং প্রচারের মূল কারণ হলো একজনের অভ্যন্তরে থাকা নিষিদ্ধ আনন্দ। আর তাই মুদ্রিত পাতায় এমন কোনো তথ্য পেয়ে গেলেই সে মুহূর্তে সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে।

আসলে রাষ্ট্র তার স্বার্থে ইতিহাস নিজের মতো করে লেখে। সেটাকে বিবেচনায় না আনলে মিথ্যা আর মানিপুলেশনের সাগরে একজন কূল-কিনারা পাবে না সেটা নিশ্চিত। ইবনে খালদুন তাই বলেছেন, ইতিহাসের লাইনে আলেমদের কাজ করার আগে রাজনীতি এবং এর নিয়ম-কানুন জানা থাকা উচিত। বিভিন্ন দেশের মধ্যকার ভিন্নতা, এলাকার ভিন্নতা, মানুষের জীবন ব্যবস্থা ও চালচলনের ভিন্নতা জানা থাকা চাই। বিভিন্ন যুগ এবং এলাকার ভিন্নতার কারনে মানুষের আচরণ, সংস্কৃতি, মাযহাব, গ্রুপিং ইত্যাদি ব্যাপারে যে ভিন্নতা থাকে সেটাও ঐতিহাসিকের জন্য জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। এসবের উপর তুলনামূলক জ্ঞান থাকতে হবে। যিনি ইতিহাস বর্ণনা করবেন তাকে বর্তমান এবং অতীতের অবস্থাকে তুলনা করতে হবে। তাকে অবশ্যই জানতে হবে কীভাবে একটি ব্যাপারে যুগ বদলালেও এর সামঞ্জস্যতা থেকে যায় এবং আরেকটি ব্যাপারে যুগ বদলানোর সাথে সাথে এর মধ্যে পরিবর্তন আসে। তাছাড়া যিনি ইতিহাস বর্ণনা করবেন তার সভ্যতার উত্থান পতনের কারণ ও এর ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকতে হবে।

সময় ও পাত্র ভেদে একই টাইটেলের ভিন্ন প্রভাব থাকে

ইবনে খালদুনের আবির্ভাব হয়েছিল ইতিহাসের এমন এক সংকটময় সময়ে, যখন বিভিন্ন রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন হচ্ছিল। তিনি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কারণে তিনি অনেক নতুন থিওরি দিতে পেরেছেন। সময়, স্থান, পাত্র, কালভেদে একই নামের এবং টাইটেলের ভিন্ন প্রভাব থেকে থাকে। বলুনতো, সিলেটের আজপাড়া গাঁয়ের কোন এক মসজিদের ইমাম সাহেব এবং ঢাকা শহরের নামি কোন মাদরাসার মসজিদের ইমাম সাহেব- এই দুইজনের মর্যাদা সক্ষমতা এবং ক্ষমতা কি এক? সমান? উত্তরে বলবেন না, নেই। ঠিক তেমনি হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম সাহেবের যে স্ট্যাটাস ও সক্ষমতা সেটা সাধারণ একটি মাদরাসার মুহতামিম সাহেবের নেই। বিষয়টা আমরা যত সহজে বুঝি সেটা কিন্তু অনেকেই এত সহজে বুঝেন না। অনেক ঐতিহাসিক এখানে এসে ভুল করেছেন।

এই বিষয়টাকে সামনে রেখেই ইবনে খালদুন লিখেছেন:

> "Another illustration of the same kind of error is the baseless conclusion critical readers of historical works drew when they hear about the position of Jadges, leadership in war and the command of armies judges exercise."

ইতিহাসের ছাত্ররা যখন আগেকার বিচারকদের কাহিনী পড়েন, তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্বদান ও সেনাবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব ইত্যাদি দেখেন। তারা একটি ভুল করে বসেন। তারা ভাবেন বর্তমানের বিচারকদের মনে হয় এই একই সক্ষমতা রয়েছে। তারা অনেকেই এই ভেবে নিজে বিচারক হতে চান যে, মনে হয় বিচারক হলে পূর্বেকার বিচারকদের মত ক্ষমতার এক্সারসাইজ করতে পারবেন। তারা কেন এই ভুল করেন?

ইবনে খালদুন এর কারণ ব্যক্ত করেছেন,

> " They are not aware of the changes in customs it has affected the office of judges"

অর্থাৎ বিচারকের অফিসের কাজের ধরন ও সংস্কৃতি যে বদলেছে সে ব্যাপারে তারা অনেকেই সচেতন নন। যেমন, অতীতের কাজী এবং বাংলাদেশে যে কাজী বিয়ে পড়ান তাদের সক্ষমতা, মর্যাদা এবং

ক্ষমতার পরিধি এক নয়। কিংবা আগেকার কাজী এবং এখনকার কোর্টের বিচারক (কাজী) যারা আছেন তাদের মধ্যকার সক্ষমতা এক নয়। আশ-শিফার লেখক কাযি ইয়ায কিংবা স্বয়ং ইবনে খালদুন এবং বর্তমানের বিয়ে-শাদি পড়ানো কাজীর সক্ষমতা সমান নয়। অথবা কাজী আলী ইবনু আবি তালিব ও বর্তমানের একজন বিচারক-দুজনের মধ্যকার কমান্ড ও পাওয়ারের কোন তুলনা করাই হাস্যকর হবে। অথচ পদবী একই।

এবার ভারত উপমহাদেশের সদ্য গত হওয়া ইতিহাসের দিকে একটু লক্ষ্য করি। ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়, তখন আলেমরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এরই অংশ হিসেবে থানা ভবনে মাওলানা কাসিম নানুতবী রহঃ-সহ শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সফল না হলেও তাদের আন্দোলন চলতে থাকে। মাওলানারা দেখলেন যে, ব্রিটিশরা বিভিন্নভাবে মুসলমানদেরকে সত্যচ্যুত করার চেষ্টা করছে।

আজ থেকে দেড়শ বছর আগে তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, আযাদী আন্দোনের মাধ্যমেই শুধু নয়, আযাদী আন্দোনের পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রেও কাজ করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে তারা 'দারুল উলূম' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। যার মতাদর্শিক অনুপ্রেরণা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। তাদের লক্ষ্য সফল হয়েছিল। লক্ষ্য অনুযায়ী আমরা দেখেছি, দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্ররা শিক্ষা শেষে আন্দোলন-সংগ্রামে ব্যাপকভাবে অংশ নিতেন। উদাহরণস্বরূপ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম বলা যায়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কারণে তাঁকে মাল্টায় জেলে বন্দি করে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। সেই জেলকে আজকের গুয়ানতানামো-বে হিসেবে তুলনা করা চলে। মাহমুদুল হাসান রহ. এর নেতৃত্বে 'রেশমি রুমাল' আন্দোলন নামেও একটি আন্দোলন সংগঠিত হয়। খেলাফত পুনরুদ্ধার করার জন্য তারা আন্দোলন করে যান। আরেক মাওলানা ছিলেন উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ.। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি আফগানিস্তান, রাশিয়া, তুরস্ক ও আরব ওয়ার্ল্ড সফর করেন এবং খেলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করে গেছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী রহ.-সহ দেওবন্দের ছাত্র-উস্তাদরা সবসময় শঙ্কিত থাকতেন, পুলিশের হয়রানি এড়াতে আত্মগোপনে থাকতেন। এভাবে প্রতিকূলতার মাঝেও সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। এবার অবস্থাটা চিন্তা করুন। এই ছিল এক সময়ের চিত্র। কিন্তু এখন সময় বদলেছে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের আচার-আচরণ, চাহিদাও বদলেছে। এরই সাথে মানুষের আচার-আচরণের ধরণটাও বদলে গেছে। কিন্তু টাইটেল বদলেনি। বর্তমান সময়েও মাদরাসা পড়ুয়া মাওলানারা আছেন, আগেও ছিলেন। কিন্তু দু'দলের কাজের তুলনা করলে, ক্ষমতার তুলনা করলে, আকাশ-পাতাল ভিন্নতা পাবেন।

হুসাইন আহমদ মাদানী রহঃ, মাহমুদুল হাসান রহঃ, রশীদ আহমদ রহঃ, আহমদ শহীদ বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের ভারতব্যাপী যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, এবং রিভাইভাল আন্দোলনে তাদের যে অবদান ছিল। ভারতে তাদের যে পলিটিক্যাল মেনুওভার করার সক্ষমতা ছিল সেটা এখনকার মাওলানারা ধারণ করেন না। তাদের রাজনৈতিক অনুসারীরা আর সেই রকম সক্ষমতার অধিকারী নন। কেউ যদি মনে করেন যে, হ্যা, তারা সেই সক্ষমতা রাখেন, তাহলে তিনি ভুল করবেন। এখানেই সেইসব গ্রেট গ্রেট মাওলানাদের সাথে ক্ষমতা ও সক্ষমতার বিচারে তাঁদের অতীত পূর্বসূরিদের থেকে বর্তমান রাজনৈতিক অনুসারীদের ভিন্নতা।

যেমন মানুষের উপর তখনকার আলেমদের যে অধিনায়কত্ব ছিল, বর্তমানের ইসলামপন্থীদের সেই অধিনায়কত্ব নেই। বর্তমানে দেখা যায়, অনেক ইসলামপন্থীরা সরকারকে আল্টিমেটাম দিয়ে যান যে,

তিনদিনের মধ্যে দাবি পূর্ণ করতে হবে, অন্যথায় রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া হবে। এ সময় তাদের অনেক অনুসারীরাও ভুল করেন এই ভেবে যে, দেখুন কী বাপের বেটা, কী আল্টিমেটাম দিয়েছেন। এখন একদিন সরকারের আর না হয় আমাদের একদিন। তারা আমলে নেন না যে, বর্তমানের যে ইসলামপন্থীরা আছেন তাদের নেতৃত্ব এবং ইসলামপন্থীরা দুর্বল প্রাণশক্তির।

দীর্ঘকাল দুনিয়ার কর্মকাণ্ড, আন্দোলন-সংগ্রাম, সমাজসেবা ও রাজনীতি থেকে দূরে থাকায় এবং নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জনসাধারণের সাথে যে ইস্পাতকঠিন সম্পর্ক থাকার কথা ছিল, সেটা এখন নেই। ইসলামপন্থীরা জুলুমের বেড়াজালে আবদ্ধ। তাদের উপর জুলুম নির্যাতন করা হচ্ছে এবং হিউমিলিয়েশনকে তাদের অনেকেই সাদরে গ্রহন করে নিয়েছেন। অনেক ইসলামপন্থীরাই ভাবেন যে, দেশের নাগরিক হিসেবে, ঐতিহাসিকভাবে আন্দোলনকারী ও স্বাধীনতাকামীদের অনুসারী হিসেবে তারাও ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে অংশ নিতে পারবেন। বা ক্ষমতা-সক্ষমতা ধারণ করেন।

কিন্তু তারা আমলে নেন না যা ইবনে খালদুন বলেছেন:

“the ability to gain power through group feeling and mutual cooperation has been lost.”

অর্থাৎ পারস্পরিক যে উম্মাহ অনুভূতি আছে, সকল মুসলিম একই দেহের মতো। দেহের একটি অংশে আঘাত লাগলে সবকটি অংশ এর ব্যথা অনুভব করে। বর্তমানে এই অনুভূতিটা হারিয়ে গেছে। এ কারণে দেখা যায় যে, বর্তমানে ছোট ছোট দলের ভেতরে ঐক্য সম্ভব হয় না। এমন আদর্শিক ঐক্য যা ক্ষমতা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। সেটা হারিয়ে গেছে। আজকের ইসলামপন্থীরা সরকারগুলোর- সেটা বাংলাদেশ হোক অথবা দুনিয়ার যেকোন জায়গায় হোক- তারা সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী নন, সাবজেক্ট হিসেবে আছেন। সরকার এই সাবজেক্টকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং ব্যবহার করে। অনেকে এটা আমলে না নেয়ায় কিছুটা ভুল করেন। এর মধ্যে একটা ভুল হল, যা ইবনে খালদুন বলেছেন:

“therefore among them professional man and artisans are to be found perceiving power and authority and eager to abtain them”

অর্থাৎ, তাদের মধ্যকার অনেক দক্ষ লোক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে যান। এই বিষয়ে বর্তমানের অনেক লাইফটাইম ইসলামিক রাজনীতিকও ভুল করেন। তারা ভুলে যান সেক্যুলার রাজনীতিবিদরা যে ভ্যালু ও যে আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করে, যে আদর্শিক শক্তির উপর বর্তমান রাজনৈতিক দল এবং সরকার প্রতিষ্ঠিত সেই একই সংস্কৃতি তারা বহন করেন না। বরং তারা বিপরীত সংস্কৃতি থেকে আসছেন। তারা যদি ইসলামী আদর্শ, সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ছেড়ে দিয়ে সেক্যুলার সংস্কৃতি আলিঙ্গন করেন তাহলে তাদের সমর্থকগোষ্ঠী হারাবেন নিশ্চিত। যদি তারা সমর্থক হারিয়ে ফেলেন তাহলে চূড়ান্তভাবে ক্ষমতাই হারাবেন। অন্যদিকে যদি সেক্যুলার আদর্শ তারা গ্রহণ না করেন, তাহলে ক্ষমতা এবং শাসন অর্জন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আমরা এই স্ট্রাগলটা দেখতে পেয়েছি। আমরা দেখেছি অনেকেই এমপি বা মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। এটা করতে গিয়ে তারা ইসলামপন্থীদের মধ্যে থাকা স্পৃহা, আদর্শ এবং চাহিদাকে অবজ্ঞা করেন। তাদের অনুসারীদের মধ্যকার চাহিদা ও স্পৃহাকে উপেক্ষা

করেন। তারা ভুলে যান এই আদর্শের কারণেই তারা আজকে এমপি ও মন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন। ফলশ্রুতিতে তারা এই চেয়ারটা দখলে নিলেও নিতে পারেন, কিন্তু তারা প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন না। কারণ তাদের আগের সেই সম্মান, সক্ষমতা, সাপোর্ট ব্যাংক আর অবশিষ্ট থাকে না। তারা হয়তো এমপি হতে পেরেছেন। কিন্তু অন্যান্য সেক্যুলার এমপি-মন্ত্রীদের মতো সমান ক্ষমতা তারা ধারণ করতে পারেন না।

অথচ আমরা দেখি তুলনামূলকভাবে কম সমর্থক এবং আর্থিক ও সামাজিক কম সাপোর্ট নিয়ে সেক্যুলার এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদরা অনেক বেশি সুপ্রিয়রিটি, ক্ষমতা ইত্যাদি অর্জন করতে পারেন। এর কারণ হলো, তারা সেক্যুলার আদর্শ, সেক্যুলার ভ্যালু ধারণ করে। আর তাই ইবনে খালদুন আমাদের বলছেন, নাম, টাইটেল বা চেহারা দেখেই কোন কিছু আশা করা, কোনো একটা কমেন্ট করে বসা অথবা একটি সমাপ্তি টেনে দেয়া ভুল হবে। বরং পুরো অবস্থা যাচাই করতে হবে, তারপর ক্রিটিক্যালি যাচাইয়ের পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাছাড়া যে পথে হাঁটলে সফলতা অর্জন সম্ভব নয় সেই পথে না হাঁটার জন্য তিনি বলেছেন। কিন্তু অনেকেই ভুল অ্যানালিসিস অনুসরণ করে ভুল পথে হাঁটেন।

অপ্রয়োজনীয় সিলেবাসে শিক্ষাদান

ইতিহাসের ছাত্ররা মাঝে মাঝে কিছু ভুল করে বসেন। যেমন, রাজবংশের বা রাষ্ট্রের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অনেকেই একটা ভুল করেছেন। ইতিহাস লিখতে গিয়ে তারা শাসকের পিতা-মাতার নাম, দাদার নাম, এমনকি কতজন চাকর ছিলেন তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। ইবনে খালদুন বলেন:

> "In this respect, they blindly follow the tradition of the historians of the Umayyah and Abbasid dynasties. Without being aware of the purposes of those historians."

অর্থাৎ, তারা পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের লেখা চোখ বুজে কপি করে গেছেন। তারা ঐসব উমাইয়্যাহ ও আব্বাসী ঐতিহাসিকদের অভিপ্রায় আমলে নেননি।

সরকারি ঐতিহাসিকরা তাদের বইয়ে শাসকদের পারিবারিক অনেক তথ্য এজন্য সংযুক্ত করেছেন, যাতে সেইসব শাসকদের সন্তানরা ক্ষমতায় আসার পরে সেখান থেকে তথ্য পেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী ঐতিহাসিকদের তাঁদের বইয়ে, কথায় ও শিক্ষাদানে তা চোখ বুজে কপি করা ছিল ভুল। কারণ যুগের পালাবদলে অনেক নতুন নতুন রাজবংশ ও রাষ্ট্রের উত্থান-পতন হয়েছে।

ইবনে খালদুন বলছেন:

> "Therefore, it is pointless for an author of the present time to mention the sons and wives, the engraving on the seal ring, the surname, judge, wazir and doorkeeper of an ancient dynasty"

বর্তমান সময়ে একজন ঐতিহাসিকের জন্য পূর্বেকার রাজবংশের খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণনা করা বা শিক্ষা দেয়া অর্থহীন।

আজকের দিনে আমরা কি একই বিষয় দেখছি না? শুধু কি ইতিহাস? ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন অনেক অপ্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। যা কিছু বিতর্কের রসদ ছাড়া দুনিয়া-আখেরাতে কোনো লাভ নিয়ে আসবে বলে ধারণা করা যায় না। বর্তমানে আমরা দেখি, অনেক অপ্রয়োজনীয় সিলেবাস শিক্ষা দিয়ে সময় বরবাদ করা হচ্ছে। আমাদের মাদরাসা কিংবা জেনারেল লাইনে, দুই শিক্ষা ব্যবস্থায়ই অনেক অপ্রয়োজনীয় সিলেবাস

সংযুক্ত করে রাখা হয়েছে। ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কমাশিশা ডট কমে "কওমী মাদরাসা সংস্কার: মৌলিক না আংশিক" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনে ঈসা মানসূরীর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছিল।

তিনি বলেছেন: "আমাদের উলামায়ে কেরামের একটি শ্রেণী দেড়শত বছর পূর্বের পুরাতন ও বিলুপ্ত চিন্তা-চেতনা ও দর্শন সংক্রান্ত অনর্থক আলোচনায় লিপ্ত। ইসলাম ধর্ম আত্মপ্রকাশের সময় যেমন খৃস্টান আলিমগণ গ্রীক দর্শন চর্চার অনর্থক কাজে লিপ্ত ছিল।"

তিনি আরো বলেছেন: "আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে এভাবে উল্লেখ করেন, "আজ আমাদের সমাজে বেশিরভাগ মানুষ পশ্চিমাদের দর্শনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। এর আসল কারণ আমাদেরই দূর্বলতা। আজ যেখানে আমরা ইসলামের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গড়ে ওঠে ইসলাম সম্পর্কে সর্বশ্রেণীর মানুষের সন্দেহ-সংশয়ের অপনোদন করার কথা ছিল। আমরা সেখানে আজ ফেকাহের মুস্তাহাব-সুন্নাত সম্পর্কিত, শাফেয়ী-হানাফিদের মধ্যে বিতর্কিত কিছু বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে এগুলোকে প্রমাণাদিসহ উপস্থাপন করে এর পিছনে নিজেদের মেধাকে ব্যয় করাকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। এবং তা করতে পেরে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছি। অথচ হাজার হাজার, লক্ষ-লক্ষ বনী আদম আজ ঈমান হারাচ্ছে। সন্দেহ-সংশয় তাদের নিত্যসঙ্গী। তাদেরকে সঠিক পথে আনার আমাদের কোনো ফিকির নেই। এরপর মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) এর বক্তব্য উল্লেখ করেন। "একবার তিনি লাহোরে এলে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তারা তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তাদের মনে যত প্রকার প্রশ্ন ছিল, সব মাওলানার সামনে পেশ করলেন। এগুলো শুনে মাওলানা কাশ্মিরীর মনে ব্যথা জাগল।

সকালবেলা মুফতি মুহাম্মাদ শফি (রহঃ) দেখা করতে গেলে দেখলেন তিনি একটি বাক্য বারবার বলছিলেন: "আমার জীবন বৃথা গেল, আমার জীবন বৃথা গেল।" মুফতি শফি সাহেব তখন বললেন, হযরত! আপনি কি বলছেন? আপনি তো গোটা জীবন হাদীসের খেদমত করেছেন। আপনার লক্ষ লক্ষ ছাত্র আছে। তাদের কেউ মুহাদ্দিস, মুফতি, লেখক, গবেষক ইত্যাদি। দেশে-বিদেশে সর্বত্র তাঁরা ছড়িয়ে রয়েছেন। তো আপনার জীবন কী করে বৃথা গেল? প্রত্যুত্তরে আল্লামা কাশ্মিরী বললেন, আমরা হাদীস পড়াচ্ছি, কিতাব পড়াচ্ছি, এ মাসআলায় হানাফিদের পক্ষে এ দলীল আছে, শাফেয়ীদের পক্ষে ঐ দলীল আছে। প্রত্যেক মাযহাবের দলীল পেশ করে হানাফী মাযহাবের প্রধান্য প্রমাণ করি। অথচ মাসআলা সুন্নাত ও মুস্তাহাব পর্যায়ের। কিন্তু আমি আজ বাইরে বের হয়ে জনসাধারণের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে বুঝতে পারলাম তাদের কেউ আল্লাহকে অস্বীকার করছে, কেই নবীকে অস্বীকার করছে, শিরক করছে। কেউ কুরআনকে অস্বীকার করছে। তাদের মধ্যে সুন্নাত-মুস্তাহাব মাসআলার বিরোধ নিয়ে আলোচনা চলছে না। তারা সমাজের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্য আমি কী কর্মসূচি দিয়েছি? তাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য কি কি ধারা বর্ণনা করেছি? আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার না করার জন্য আমি কী মূলনীতি উপস্থাপন করেছি?"

বর্তমানে আমাদের জরুরি বিষয় হলো জনসাধারণের প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা। তাদেরকে দ্বীনের প্রতি ফিরিয়ে আনার জন্য মূলনীতি, কর্মসূচি ও কর্মধারা প্রণয়ন করা। তাদেরকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে সরিয়ে এনে ইসলামের গন্ডির ভেতরে প্রবেশ করাতে হবে।

আল্লামা কাশ্মিরীর কথা থেকে স্পষ্ট, যা বর্তমানে আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। অপ্রয়োজনীয়

জ্ঞানার্জন, বিতর্ক, শর্টকোর্স ইত্যাদির পেছনে অনেকেই সময়ের অপচয় করছেন। ছুটে বেড়াচ্ছেন। যুগ চাহিদা, টার্ম, সমস্যার আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা হচ্ছে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যে ব্যাপারে ইবনে খালদুন বলেছেন:

> "Present day authors mention all these things in mere blind imitation of former authors, They disregard the intention of former authors and forget to pay attention to historiography`s purpose."

অর্থাৎ, অতীতের লেখকদের বই, সিলেবাস বর্তমানকালের লেখকরা চোখ বন্ধ করে কপি করে যাচ্ছেন। বর্তমানের অনেক লেখকই অতীতের লেখকদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনছেন না। বর্তমানে মূলনীতি ঠিক রেখে আক্বীদার বইগুলো নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা সময়ের দাবি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই বর্তমানকালের আক্বীদা ও ফিক্বহের বড় বড় ইস্যুগুলোকে এড্রেস করে সিলেবাসের বইগুলো ব্যাখ্যা করে পড়ানো হচ্ছে না। কিছু লোক আছে শুধু কুরআন থেকে দলীল মানে। হাদীসের নির্ভেজালত্ব স্বীকার করে না। এদের অস্তিত্ব আগেও যেমন ছিল, এখনো আছে। তাদের অবস্থান, হাব-ভাব, চালচলন বিশদ ব্যাখ্যা করে ছাত্রদের পড়ানো উচিত। বেশ আগে ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত উসূলে হাদীসের উপর একটি ছোট্ট রিসালা পড়েছিলাম। সেখানে ভূমিকাতে হাদীসের হস্তান্তরণ ও সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়েছে। ভাবতে পারেন? ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের মত একটি প্রতিষ্ঠান, হাদীসের উপর লেখা বইয়ে হাদীস নিয়ে সন্দেহ তৈরি করে দিচ্ছে।

প্রতিটি যুগের পরিবর্তনে ফিতনা তার নাম পরিবর্তন করে মানুষকে ধোঁকা দেয়। আর তাই মুসলিম শিক্ষাবিদদের উচিত হবে এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর কাজ করা। যেমন: সেকুলারিজম, লিবারালিজম, গণতন্ত্র ও ইন্ট্রারফেইথ ইত্যাদি। এসবের নামে সাধারণ মুসলিমদের কীভাবে ধর্মহীন করা হচ্ছে সেটা নিয়ে গঠনমূলক, একাডেমিক আলোচনা করা ও সিলেবাসের আক্বীদার আওতায় ব্যাখ্যা করে শিক্ষা দেয়া ছিল জরুরি। বর্তমানে এগুলো শিক্ষাদান জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম যদি জানেই না, সে বুলেটের গতিতে ঈমান হারাচ্ছে, তাহলে তার এই ঈমানহীন শরীরের বোঝা বয়ে বেড়ানোর কীইবা মূল্য থাকতে পারে। বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায়। এখানে ডক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা হয় না। এটা আশা করাও হয় না। তবে এখানে আক্বীদা শিক্ষা দেয়া হয়। এখান থেকে যুগের বড় বড় ফিতনা এড্রেস করা না হলে এসব প্রতিষ্ঠান স্বয়ংক্রিয় ভাবেই আস্থা হারাবে।

করোনা ভাইরাস; ব্ল্যাক ডেথ!

ইবনে খালদুন লিখেছেন:

> "History refers to events that are peculiar to a particular age or race. Discussion of the general conditions of regions, races, and periods constitutes the historians foundation." (P-29)

অর্থাৎ, ইতিহাস এমন সব ঘটনার উল্লেখ করে যা একটি নিদিষ্ট যুগ ও জাতির সাথে জড়িত। স্বাতন্ত্রতার সাথে ও অসাধারণত্বে। একটি এলাকার, জাতির ও সময়কালের সাধারণ অবস্থাই ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বর্ণনার ভিত্তি হয়ে থাকে।

তবে ইতিহাস যদি একটি নিদিষ্ট সময়কাল, জাতি ও ঘটনাবলির অবস্থা বর্ণনা করে তাহলে আমাদের সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকরা কী আলোচনা করতে পারেন বলে ধারণা করা যায়? চলুন মুসলিম জাতির গত একশো বছর সময়কালের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে একটা ধারণা নেয়া যাক। যেমন, সাইকস-পিকট চুক্তি। আমরা জানি ঐতিহাসিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলী বিশ্ব ইতিহাসের পট পরিবর্তনে প্রধানতম ভূমিকা রেখেছে।

১৯১৫ সালের শেষ দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া ছিল একপক্ষে। অন্যপক্ষে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও উসমানি খিলাফাহ। এসময় বৃটিশরা একটি চাল চালে। তারা মক্কার শরীফ হোসাইনকে বিদ্রোহের জন্য বলে। এর বিনিময়ে শরীফ হোসাইনকে তারা প্রতিশ্রুতি দেয়, উসমানিরা যুদ্ধে পরাজিত হলে, খিলাফতের অধীনে থাকা জেরুজালেমসহ পুরো আরব এলাকা নিয়ে তাকে একটি আরব দেশ বানিয়ে দেয়া হবে ।

বৃটিশরা যদিও চুক্তি করেছিল, কিন্তু চুক্তির পূর্বেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এটা তারা রক্ষা করবে না। তারা শুধু শরীফ হোসাইনকে ব্যবহার করবে। তাই দেখা গেল একই সময় তারা মিত্রশক্তি ফ্রান্সের সাথে সম্ভাব্য পরাজিত উসমানী খিলাফতের অধীনে থাকা জমি ভাগ বাটোয়ারা করার জন্য আরেকটি চুক্তি করে। সাথে সাথে তারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদেরকেও প্রতিশ্রুতি দেয় ফিলিস্তিনের মালিকানা দেয়ার। বৃটিশদের এই ধোঁকা বুঝতে পারেনি শরীফ হোসাইন। তার যদি সমসাময়িক ইতিহাস জানা থাকতো তাহলে হয়তো তিনি এরকম সিদ্ধান্ত নিতেন না। কারণ কিছুদিন আগেও বৃটিশরা ভারত উপমহাদেশে মুঘলদের ধোঁকা দিয়েছিল।

যাইহোক, গোপন এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বৃটিশদের পক্ষে ছিলেন মার্ক সাইকস ও ফ্রান্সের পক্ষে জর্জ পিকট। মার্ক সাইকস বলেন, আমি যখন বৃটিশ পার্লামেন্টে চুক্তির ব্যাপারে আপডেট দিতে যাই, তখন দেখলাম, পার্লামেন্টের সবচেয়ে বড় ভীতি ছিল, যদি নতুন এক আরব খেলাফত প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। অবশ্য তাদের জন্য কাজ সহজ করে দেয়, বিভিন্ন ভুল ও ইসলামবিরোধী মতাদর্শে জর্জরিত মুসলিম জাতি। বৃটিশরা শুধু তাদের মধ্যে আরেকটু জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দেয়। এদিকে সাইকস-পিকট বসে অগ্রিম ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় সমগ্র আরব ভূখণ্ড। অঞ্চলটি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ধারণা না থাকায়, কলমের খোঁচায় যেমন খুশি তেমনিভাবে বর্ডার টেনে দেয় তারা। সাইকস-পিকট চুক্তির পরে আরো বেশ কিছু সিরিজ চুক্তি হতে থাকে। চলে প্রয়োজনমত পরিমার্জন পরিবর্তন। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বৃটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থ। তাই দেখা গেছে নামধারী ও নকল স্বাধীনতার নামে তারা তাদের নিজেদের লোক বসিয়ে দেয় ছোট ছোট দেশে ভাগ করে দেয়া খিলাফতের এই অঞ্চলকে।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তারা এমন লোকদের শাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়, যারা বংশীয়ভাবে বড় বা প্রভাবশালী নয়। কিংবা সংখ্যাগুরু গুষ্ঠির লোক নয়। আক্বীদা ও বিশ্বাসে ঐ এলাকায় বসবাসরত মানুষের সাথে মিল নেই। এটা এজন্য করা হলো, যাতে এইসব শাসক সবসময় ইনসিকিউরড থাকে ও জনগণের শাসক হতে না পারে। যাতে দেশের মানুষের সমর্থন না থাকায় একমাত্র বিদেশি শক্তির সহযোগিতায়ই ঠিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে বৃটেন ও ফ্রান্স দীর্ঘকালীন লুটপাটের ব্যবস্থা করে রাখে। চলতে থাকে জুলুম, নির্যাতন ও লুণ্ঠন। আরব শাসকরা হয়ে উঠে ডিক্টেটর। পাশ্চাত্য দেশগুলো মুসলিম বিশ্বের সম্পদ লুঠ করে গড়ে তুলে সম্পদের পাহাড় ও চোখধাঁধানো শহর, বন্দর, এয়ারপোর্ট। কিন্তু কোনো কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। একসময় সাধারণ মানুষ ডিক্টেটরদের বিরুদ্ধে বেদ্রোহ ঘোষণা করে।

লুটপাটের সময় যেমন এর প্রভাব আরবের মরুভূমি অতিক্রম করে এশিয়ায় এসে পড়েছিল, ঠিক তেমনি বিদ্রোহের বাতাসও সবখানে বয়ে যায়। ২০১০ সালে পুরো আরব বিশ্বে শুরু হয় বিপ্লব। সরকারবিরোধী বিদ্রোহ। আরব স্প্রিং। একে একে পতন হয় আরব ডিক্টটরদের। কিন্তু যে পশ্চিমা সমাজ এতোদিন পায়ের উপর পা তুলে অন্যের সম্পদে আয়েশ করে খেলো, তারা কী- আপনি বলবেন আর এমনিতেই সবকিছু ফেরত দিয়ে দিবে? সেটা ভাবা হবে বোকামি। বরং তারা মানুষকে তাদের সম্পদ ও জমিন ফিরিয়ে না দিয়ে সেগুলো ধরে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং যাবে। আজকের মধ্যপ্রাচ্যে আমরা এই অবস্থাই পর্যবেক্ষণ করছি। পুরো মধ্যপ্রাচ্যে এখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, ভারত উপমহাদেশ, মধ্যএশিয়া, উত্তর আফ্রিকাসহ সবখানে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। প্রত্যেক প্লেয়ার চাচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যেতে। আমরা ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ পার করছি।

এরই মধ্যে ঘটে গেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থানে এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। যেমন, 'নাইন ইলেভেনের হামলা' মুসলিম বিশ্বে 'আমেরিকার ইনভেশন' জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা, ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি খ্যাত আমেরিকা-তালেবান চুক্তি। সৌদি ও আরব আমিরাতের নেতৃত্বে আরব বিশ্বের ইসরায়েলের প্রতি ঝুকে পড়া। রাজনৈতিক, টেকনোলজি ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসরায়েলের উত্থান। ইসরায়েলের এখন আর আমেরিকার প্রয়োজন নেই। এশিয়ায় ভারতের উত্থান ও চীনের ইরান ও পাকিস্তানের সাথে এলায়েন্স। তবে এসবকিছুই ইতিহসের অংশ। এইসব ঘটনাবলীই ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য সেটা বুঝাতেই ইবনে খালদুন বলেছেন:

> “History refers to events that are peculiar to a particular age or race. Discussion of the general conditions of regions, races, and periods constitutes the historians foundation.” (P-29)

তিনি মাগরিবের তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থা বুঝাতে বলেছেন,

“The situation on the Magrib, as we can observe, has taken a turn and changed entirely.”

তেমনি আমরা বলতে পারি, খিলাফাহ উসমানিয়া পতনের পরে পুরো বিশ্ব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। মাগরিবের যে এই অবস্থা সেটা চলতে থাকে দীর্ঘকাল। যেমন তিনি বলেছেন,

> “This was the situation until, in the middle of the eighth (fourteenth) century.”

অর্থাৎ ১৪শ শতক পর্যন্ত চলতে থাকে এই অবস্থা। তবে ১৪শ শতকে কী এমনটা ঘটলো, যার কারণে সবকিছু ফের বদলে গেল? তিনি বলছেন,

> “in the middle of the eighth (fourteenth) century, civilization both in the east and the west was visited by a destructive plague.”

অর্থাৎ “১৪শ শতকে পূর্ব ও পশ্চিমের সভ্যতাকে এক ধ্বংসাত্মক প্লেগ বা মহামারি আক্রমন করে গ্রাস করে নেয়।” বিষয়টাকে ইবনে খালদুন এমন শব্দমালা দিয়ে বর্ণনা করেছেন যা পড়লে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। এই প্লেগ বা মহামারির ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

> “which devastated nations and caused populations to vanish.”

অর্থাৎ দেশ ও জাতিগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। আমরাও আজকে একই ধরণের এক মহামারির সামনে উপস্থিত। যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। করোনা ভাইরাস আর ইবনে খালদুনের সময় আসা ব্ল্যাক ডেথ প্রায় অনুরূপ। তিনি লিখেছেন:

> “It swallowed up many of the good things of civilization and wiped them out. It overtook dynesties at the time of their senility, when they had reached the limit of duration. It lessened their power and cartailed their influence. It weekened their authority. Their situation approached the point of annihilation and dissolution.”

এটা সভ্যতার অনেক অর্জনকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, গিলে ফেলেছিল। আমরা কী তাই দেখছি বর্তমানের করোনা সময়কালে? এই ব্ল্যাক ডেথ বিভিন্ন রাজত্বকে তচনচ করে দিয়েছিল। অবশ্য ঐসব রাজত্বের সে সময়টায় অন্তিমদশা চলছিল। এটা তাদের ক্ষমতা ও শক্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট করে দেয়। তাদের কর্তৃত্ব দুর্বল করে দেয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে পুরো রাজত্বই নিশ্চিহ্নতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আশ্চর্যজনকভাবে বর্তমানকালের অবস্থাটা ঠিক একই। করোনার কারণে বিপর্যস্ত নিভু নিভু সুপার পাওয়ার। আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক পতনের পথে বিশ্ব। বর্তমান বিশ্বে একই অর্থনৈতিক সিস্টেম হওয়ায় ও একটি নিদিষ্ট দেশের মনোপলি থাকায়, এর

পতনের সাথে সাথে পুরো বিশ্বের অর্থনীতি অদলবদল হয়ে যাবে। অবিশ্বাস্য কেওটিক বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে আর্থিক সেক্টরে। মহামারি পরবর্তী অবস্থা কেমন ছিল ইবনে খালদুনের সময়ে-

> " Cities and buildings were laid waste, roads and way signs were obliterated. Settlements and mantions became empty, dynesties and tribes grew week. The entire inhabited world changed."

শহরসমূহ, ভবনগুলো বিরান হয়ে যায়। রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে যায়। সাইনবোর্ড, রোড সাইন ইত্যাদি বিলিন হয়ে যায়। হারিয়ে যায়। কারণ তা রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো মানবসম্পদ বাকি ছিল না। আর্থিক সামর্থ্যও অবশিষ্ট থাকেনি। যারা মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে আছেন তারা হয়তো দেখেছেন, পুরোদমে থাকা লকডাউনের সময় রাস্তাঘাট পরিস্কারের তাওফিক ছিল না স্থানীয় সরকারের। ইউরোপের অবস্থা বিপর্যস্ত। করোনা এখনো যায়নি। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত, এরকমের মহামারি কয়েকবছর ব্যাপী ধ্বংসলীলা চালায়। করোনার তো কেবলমাত্র বছর পার হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেকান্ড ওয়েইব আসছে বলে বিশ্লেষকরা মত দিয়েছেন। খালদুনের সময় জনবসতি, বড় বড় প্রসাদ ও বাড়িঘর খালি হয়ে গিয়েছিল। রাজত্ব ও সমাজব্যবস্থায় ধস নেমেছিল, দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। মানুষের আবাদ করা পুরো বিশ্বটা মুহুর্তে বদলে গিয়েছিল।

> "It was if the voice of existence in the world had called out for oblivion on restrictions, and the world had responded to its call. God inherits the earth and all who dwell upon it."

মনে হচ্ছিল অস্তিত্বে থাকা সকল কিছুই ডাক পেয়েছিল অন্ধকারের দিকে। আর দুনিয়াটাও সাড়া দিয়েছিল সেই ডাকে। আর কেন হবে না, আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

الم تر ان الله يسجد له من فى السموت ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجروالدوابّ وكثير من الناس وكثير حقّ عليه العذاب ومن يّهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء

আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যারা আসমানসমূহে ও যারা আছে যমীনে, আর সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউই নেই; নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরা হজ্ব-১৮)

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) বলেন, "এ বিশ্ব জগতের ছোট-বড় সব সৃষ্টিই রূপ, আকৃতি ও গঠন প্রকৃতির পার্থক্য ও ভিন্নতা সত্ত্বেও এমন এক সালাত ও হামদ-তাসবিহাতে সদা মশগুল রয়েছে, যা তাদের সৃষ্টিগত দায়িত্ব ও প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ।" (আরকানে আরবা'আ)

মানুষ সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। তাদের জন্য নিয়োজিত পুরো বিশ্ব জগতের মাখলুক। যখন মানুষের চলাফেরা, আইন-আদালত, বিচারব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে না সৃষ্টিকর্তার দেয়া নিয়মে, তখন প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই ব্যত্যয় ঘটবে। শুরু হবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারি, মঙ্গা প্রভৃতি।

কারণ, প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাবে। তখন তারা ডাক দেবে অন্ধকারের পথে, এটাই স্বাভাবিক। এটাকে পুনরুদ্ধার করতে ফিরে যেতে হবে বিশ্ব প্রতিপালকের দিকে। তখনই বিশ্বে, প্রকৃতিতে আসবে

ভারসাম্য, শৃঙ্খলা। এই বিশ্ব আল্লাহর, যা কিছু আছে এখানে সবকিছুই তার। তিনি সেটা ফিরিয়ে নেবেন। অন্য কাউকে দান করবেন। এক বছর বা তিন বছর যে সময়কালই হোক, এক সময় করোনা মহামারির অবসান হবে। বিশ্ব তখন কেমন হবে? ভেবেছেন কি? কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে ইবনে খালদুনের সময়কার মহামারির পরে যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে। তিনি লিখেছেন:

“it is as if the entire creation had changed, a world brought into existence anew.”

“যেন একটি নতুন বিশ্বের জন্ম দেয়া হয়েছে।”

করোনার ব্যাপারে মনে হচ্ছে সেটাই। ঘুনে ধরা পাশ্চাত্য সমাজের বুকে হয়তো সর্বশেষ পেরেক। হয়তো বিশ্ব দাবড়ে বেড়ানো মোড়লদের চুপশে যাওয়ার ট্যাবলেট এটা। হয়তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য মাঠ পরিস্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রকৃতিকে। যাতে করে তারা বিশ্ব নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন।

সহযোগিতার মানসিকতা সাফল্যের চাবিকাঠি

এপর্যায়ে এসে ইবনে খালদুন কিছু আলেমের বক্তব্যের উদ্ধৃতি এনেছেন। যেমন তিনি বলেছেন: "human beings co-operate with each other for their existence" অর্থাৎ, মানুষ তাদের অস্তিত্ব ঠিকিয়ে রাখার জন্য একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে যায়। বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার স্বার্থেই মানুষকে একে অন্যের সাথে কো-অপারেট করে যেতে হয়। একজনের কাছ থেকে আরেক জনকে সহযোগিতা নিতে হয়। এজন্য একজন ব্যক্তি যদি জীবনে উন্নতি করতে চায়, তাহলে তার উচিত বেশি বেশি কো-অপারেট করা। সহযোগিতার মানসিকতা রাখা। এটা সাফল্যের চাবিকাঠি। আর কেউ যদি চায় জীবনে যতটুকু ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করেছে, সেটাই যথেষ্ট। তাহলে তার আর কো-অপরেশনের কোনো প্রয়োজন নেই। আশেপাশের মানুষকে কেউ যদি অবহেলা করে, ইগনোর করে, যোগ্য মর্যাদা না দেয়, তাহলে এক সময় সম্মানিতরা মানে মানে কেটে পড়বে। যাদের মধ্যে Dignity আছে, আত্মসম্মান আছে, তারা নীরবে সরে যায়। তেমনি কোন অর্গানাইজেশন বা রাষ্ট্রের উন্নতিতেও কো-অপারেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সংগঠন বা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি কো-অপারেশন ও সংহতি না থাকে তাহলে তা ব্যর্থ হিসেবে আবির্ভূত হবে। নতুন কোন দলের উত্থান বা কোন বিপ্লবের পথে কো-অপারেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই একটি দলের উচিত হবে সহযোগিতার পথে যত ধরনের বাঁধা আছে সেগুলোকে সরিয়ে দেয়া।

বিপরীতে বর্তমানে আমরা দেখি বিভিন্ন ব্যক্তি, রাজনৈতিক ও সামাজিক দলগুলোর কার্যকলাপ; অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ও বাইরে (internal, external) অসহযোগিতার মানসিকতা, আচরণ প্রকাশিত হয়ে থাকে। তারা এটা যদি আমলে রাখতেন যে, মূল লক্ষ্যকে প্রথম প্রায়োরিটি রেখে কীভাবে বাকি বিরোধিতাগুলোকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া যায়। যদি মূল সমস্যা দূরিকরণে ব্যস্ত থেকে ছোট ছোট সমস্যাকে সাময়িক এড়িয়ে যেতেন, তাহলে অনেক বেশি সহযোগিতা ও সংহতির পরিবেশ তৈরি হতো। তাদের কাজের পরিধি বেড়ে যেত। লক্ষ্যপানে দ্রুত এগিয়ে যেতেন। আজকে এর উপর সুনির্দিষ্ট কোন উদাহরণ টানলাম না। তবে আশা রাখি বিষয়টি কিছুটা হলেও পরিষ্কার করতে পেরেছি।

উপকরণ গ্রহণ না করা সুন্নাহ বিরোধী

"people need means to express their intention" অর্থাৎ, "মানুষকে তাদের অভিপ্রায় প্রকাশের জন্য উপায় বা উপকরণের প্রয়োজন পড়ে।"

মানুষকে তার ইচ্ছা, অভিপ্রায়, প্রয়োজন, ভালবাসা, ঘৃণা সবকিছু প্রকাশ করতে কিছু একটার সাহায্য নিতে হয়। এই প্রকৃতি দিয়েই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা তার এই সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন। সুতরাং উপায় ও উপকরণ ছেড়ে দিলে জীবন চলবে না। সমাজ চলবে না। কেউ যদি উপকরণ ছেড়ে দেয় কিংবা এর বিপক্ষে প্রচারণা করে তাহলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি বা সংগঠন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সুন্নাহ, তার শারিয়াহর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। নবীদের জীবনের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা সবসময় যুগ চাহিদা অনুসারে উপকরণ গ্রহণ করেছেন। উপকরণ গ্রহণ না করা এটা তাওয়াককুল নয়।

একবার উমর (রাঃ) কিছু লোককে কাজের সময় মসজিদে বসে থাকতে দেখে বললেন, তোমরা কারা? অর্থাৎ এই সময়ে তোমরা মসজিদে বসা কেন? এখন তো কাজের সময়। তারা বলল আমরা মুতাওয়াককিলুন। অর্থাৎ তাওয়াককুল কারী। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে আছি, কাজকর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, না তোমরা মুতাওয়াকিলুন, নির্ভরশীল। অর্থাৎ তোমরা তাওয়াককুল করছো না, তাওয়াকুল করছো। তোমরা পরনির্ভরশীল। আমরা যদি দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মের দিকে তাকাই, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার সুন্নাহ, তাহলে দেখতে পাবো এই উপকরণ দিয়েই তিনি দুনিয়াকে সাজিয়েছেন। তাই উপকরণ রেখে দুনিয়া এবং আলটিমেটলি আখেরাতের সাফল্য অসম্ভব। একজন ব্যবসা করবেন, কিন্তু পর্যাপ্ত উপকরণ নিলেন না। তিনি কি সফল হবেন? হবেন না।

যেমন ব্যবসায় সাফল্য লাভ করতে চাইলে মূলধনের পাশাপাশি অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। এই ক্ষেত্র নিয়ে স্টাডি করুন। সাফল্য-ব্যর্থতার হিসেব করুন। প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ হলে ২য়, ৩য় পথ খোলা রাখুন। বিভিন্ন কোর্স করুন। ব্যবসা লস হতে পারে এই সম্ভাবনা মাথায় রেখে এর জন্য শুরুতেই এগজিট প্লান বানিয়ে রাখেন। এসবই উপকরণ। এসব অবলম্বনের পরে যখন কেউ ব্যর্থ হয় তখন এটা তার তাক্বদির। দ্বীনের ক্ষেত্রে, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী রাজনীতির ক্ষেত্রে আজকাল মানুষ খুব বেশিই এমনটা করেন না। শরীয়া কায়েমের জন্য প্রচেষ্টা না করে অনেকেই মনে করে এমনিতেই

একদিন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শরীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এমনিতেই কেউ এসে বলবে, আপনারা তো খুব ভালো মানুষ, আসুন আপনাদেরকে আমরা রাষ্ট্র বানিয়ে দিলাম, এখন এটা চালান। কেউ মনে করেন হঠাৎ একদিন আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে এবং দুনিয়ার বুকে জুলুম বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে। মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করা শুরু করবে। এর জন্য উপকরণ গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এমন ভাবনা সম্পূর্ণ আজগুবি ও বেহুদা। অযৌক্তিক ও অপ্রাকৃতিক। সুনান আল কাউনিয়া ও সুনান আশ-শারীয়াহ দুটোরই বিরোধী। যাক ইবনে খালদুন বলেছেন, মানুষের স্বহজাত প্রবণতা ও প্রয়োজন হলো, সে কোন একটি উপকরণ গ্রহণ করে, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য। জীবনের চাকা সচল রাখার জন্য। এটা আবশ্যক।

প্রতিটি আইনের নির্দিষ্ট মাকসাদ থাকে

ইবনে খালদুন বলেন-

"Laws have their reason in the purposes they are to serve,"

প্রতিটি আইনের একটি উদ্দেশ্য থাকে যে, সে কী লক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে বা আঞ্জাম দেবে। যেমন সেক্যুলার আইন। সেক্যুলার আইনের লক্ষ্য সেক্যুলার সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেবা করা। সেক্যুলার আইনে ধর্ম রাষ্ট্র থেকে আলাদা থাকবে। উদাহরণ স্বরুপ ধর্মীয় রাজনীতি সেক্যুলার আইনের লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। কোন রাষ্ট্র যদি ধর্মীয় রাজনীতি সাময়িকের জন্য অনুমোদন করে, তাহলে সেটা শুধুই সাময়িক। সেক্যুলার আইন সেক্যুলার মূল্যবোধ, আদর্শ বাস্তবায়ন করে থাকে। এর সেবা করে যায়। সেক্যুলার আইনের অধীনে থাকা কোন দেশে যদি উদাহরণ স্বরূপ, কেউ ইসলামী পোশাক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখে, তাহলে এটা সেই রাষ্ট্রের আইনের বিপরীত। এটা শুধু এজন্য অনুমোদন করা হয়, কারণ এই মুহূর্তে সংঘর্ষ এড়িয়ে প্রথমে ধীরগতিতে সেক্যুলার আদর্শ অনুযায়ী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সেক্যুলার আদর্শ বিরোধী কিছু সহজ উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন: মুসলমানদের ধর্মীয় পোশাক, পাঞ্জাবী, তুব, বোরকা ইত্যাদি সেক্যুলার আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সেক্যুলার আইনের লক্ষ্য হলো মানুষের শরীর থেকে তা খুলে ফেলা। আজ হয়তো পারা যাচ্ছে না, কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য তাই। তবে মিডিয়ায় আমরা ঠিকই দেখি এসব পোশাক সেক্যুলার আদর্শ বিরোধী হওয়ায় এর বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রোপাগান্ডা করা হয়, হাসাহাসি করা হয়। বিভিন্ন দেশে অবশ্য আইন পাশ করে এক দুটি পোশাকও নিষিদ্ধ করা হয়। আর তাই সেক্যুলার আইনে শাসিত কোন দেশে কখনো রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলাম থ্রাইভ করবে না। ইসলামপন্থীরা ক্ষমতাবান হবেন না। এজন্য যারা ভাবছেন সেক্যুলার আইনের অধীনেই আজীবন কাজ করে যাওয়া সম্ভব, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব, কিছু একটা করা সম্ভব তারা নিশ্চিত ভ্রমের মধ্যে আছেন। তাদের উচিত হবে মরীচিকার পেছনে সময় ক্ষেপন না করে এই বাস্তবতা অনুধাবন করা। সেক্যুলার আইনের আওতায় গিয়ে কখনো ইসলামী শরীয়াহ কায়েম সম্ভব নয়। তাদের উচিত হবে সরাসরি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। কারণ ইসলামী আইনের লক্ষ্য হলো সমাজে ইসলামী আদর্শ, সংস্কৃতি বাস্তবায়ন করা।

অন্যায় সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে

ইবনে খালদুন উদ্ধৃতি টেনেছেন:

“Adultery confuses pendigrees and destroys the species”

অর্থাৎ ব্যভিচার বংশতালিকার মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং প্রজাতিগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। কীভাবে? কারণ ব্যভিচারের মাধ্যমে আসা সন্তান পরিচয়হীন হয়। এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে পরিচয়হীন পশুর সমাজ তৈরি হবে। পিতা, আত্মীয়-স্বজনহীন সমাজ তৈরি হবে। যা কোন সময় পশুর চেয়ে নিকৃষ্টতম হয়ে আবির্ভূত হবে। সামাজিক কাঠামোর পতন ঘটবে। যার পরিণতিতে একসময় মানবতা ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্যই, যে সমাজ অবাধ যৌনাচারের দিকে ডাকে তা মানবতার শত্রু। আমরা দেখি বর্তমান পাশ্চাত্য যৌন সভ্যতার বাস্তবতা এটাই। এটা এমন এক সমাজ যা সভ্যতার ধ্বংসের দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সকল প্রকার মানবিক কনভেনশন ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানবতা, মানবিকতা ধ্বংসের ট্রেস পাচ্ছি।

অবাধ যৌনাচারের দিকে ডাক দেয়া পশ্চিমারা বিকৃতির চুড়ান্তে পৌঁছে গেছে। তারা এখন ক্যাম্পেইন করছে, সমকামিতার দিকে। সে পথে শুধু ডাকছেই না, বরং সমকামিতাকে গ্রহণ করতে মানুষকে বাধ্য করছে। এটা সরাসরি মানুষের বংশবৃদ্ধির পথে বাঁধা। এটা খুন। এটা মার্ডার। এটা ধ্বংস। সুতরাং নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা ও তাদের তাবেদার গোষ্ঠি, সেক্যুলাররা মানবতাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেভাবে ব্যভিচার মনুষ্য জাতিকে ধ্বংস করে দেয়, ঠিক তেমনি হত্যা ও অবিচার মানব জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। ইবনে খালদুন উদ্ধৃতি টেনেছেন:

“injustice invites the destruction of civilization with the necessary consequence that the species will be destroyed”

“অন্যায় সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে। ফলস্বরূপ মনুষ্য প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যায়।” হ্যাঁ অন্যায়, জুলুম, নিপীড়ন, অবিচার এসব মানবতাকে ধ্বংস করে দেয়। সাধারণ মানুষ যদি কাজ করতে না পারে, সুন্দরভাবে ব্যবসা করতে না পারে, উপযুক্ত পরিবেশ না থাকে তাহলে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা হবে না। একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনীর দরকার। আর সেনাবাহিনীর জন্য প্রথম দরকার শক্ত অর্থনৈতিক ব্যাকিং।

মনুষ নিপীড়িত হলে অর্থনীতি খারাপ হবে এবং আর্মির জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক রিসোর্স আসবে না। এতে দেশ দুর্বল হবে। পতন হবে। এজন্য যেকোন নতুন সরকারের উচিত ক্ষমার পন্থা গ্রহণ করা। কোন ইসলামী দল ক্ষমতায় এলে, বা কিছুটা ক্ষমতা বা অথরিটি অর্জন করলে তাদের উচিত হবে প্রথমেই সকল মানুষকে গণহারে ক্ষমা করে দেয়া। দুনিয়ার সকল কাফেরদের মেরে ফেলা মুসলমানদের লক্ষ্য নয়। এটা সুন্নাহ পরিপন্থী। সবাইকে মেরে ফেললে কার উপর শাসন করবেন। তাই মানবতাকে হত্যা নয়, রক্ষা করাই মুসলমানদের মূল লক্ষ্য। যারা আল্লাহর এই দুনিয়ায় অন্যায় করে, তারা আল্লাহর সুন্নাহর বিরুদ্ধে কাজ করে। আল্লাহর ইচ্ছা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি দুনিয়া আবাদ করে যাবে। মুসলিম কাফের সবাই এখানে বসবাস করবে। মানুষকে মেরে ফেললে কে এই কাজকে আঞ্জাম দেবে?

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমরা দেখছি একের পর এক হত্যা ও ধ্বংস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আঞ্চলিক যুদ্ধ ও ওয়ার অন টেরর। এসবের মাধ্যমে মানুষের উপর অন্যায় ও জুলুম করা হয়েছে ও হচ্ছে। এর ফলাফল হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংস।

এটাই দুনিয়ার নিয়ম। যখনই কোন সভ্যতা সীমা অতিক্রম করেছে, নতুন সভ্যতার উত্থান ঘটেছে তখন। খালদুন এরিস্টটলের বক্তব্য এনেছেন। যেখানে তিনি বলেছেন: পৃথিবী একটি উদ্যানের মতো। যার বেড়া হিসেবে একটি রাজবংশ বা অথরিটি কাজ করে। রাজবংশ এমন একটি কর্তৃত্ব যার মাধ্যমে জীবনকে যথাযথ আচরণ দেয়া হয়। শাসক দ্বারা পরিচালিত নীতি হলো উপযুক্ত আচরণ। শাসক সেনা সমর্থিত একটি প্রতিষ্ঠান। সৈন্যরা হলো সাহায্যকারী, যাদেরকে অর্থ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। অর্থ হলো পুষ্টি বা শক্তি যা সাবজেক্ট থেকে সংগ্রহ করা হয়। সাবজেক্টদেরকে ন্যায়বিচার দ্বারা সুরক্ষা দেয়া হয়। ন্যায়বিচার একটি পরিচিত জিনিস এবং এর মাধ্যমে বিশ্ব অটল থাকে। এখানে যে আটটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, এগুলো হলো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। একটি অপরটির সাথে জড়িত।

এর মধ্যে একটি হলো, শাসকদের নিরাপত্তা বিধান। এটা নিরাপত্তাবাহিনী করে থাকে। তাদের কাজ জনগণকে নিরাপত্তা দেয়া নয়। জনগণকে নিরাপত্তা দেয় শাসক। শাসক যদি জালেম হয়, তাহলে সে তার নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করে জুলুম করে। অনেকেই বিষয়টা আমলে না নেয়ায় বুঝতে পারেন না, পুলিশ ও আর্মি কেন বারবার সরকারকেই ফেভার করে যায়। এটা ফেভার নয়। তাদের তৈরিই করা হয়েছে এই কাজের জন্য। সুতরাং সেনাবাহিনীর কাছে দেশ বদলে দেয়ার আশা করা বোকামি হবে।

বর্তমানে কিছু ইসলামী দল ভাবেন যে, সেনাবাহিনী শাসকের অবাধ্য হয়ে তাদেরকে সাহায্য করলেই তারা ইসলাম কায়েম করতে পারবেন। সেটাও মরীচিকার পথ; সম্ভাবনা ও বাস্তবতা বিবর্জিত। সেনা-পুলিশ যদি সেই কাজ করে, তাহলে সেটা হবে শাসকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। একজন বা দুজন সদস্য সেটা করলেও পুরো বাহিনীর কাছে তারা বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই বিবেচিত হবেন।

শাসক যে বাহিনী পুষে এর জন্য সে অর্থ সংগ্রহ করে জনগণের কাছ থেকে। এরিস্টেটলের মতে শাসক যদি জনগণের উপর জুলুম করে, চাঁদাবাজি করে, তাহলে জনগণ ব্যবসা বা কাজ করতে ভয় পাবে। নিরাপদ মনে করবে না। এতে দেশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে যাবে। কোষাগরে পর্যাপ্ত আয়কর জমা হবে না। ফলশ্রুতিতে শাসক তার নিরাপত্তা বাহিনীকে সময়মতো রেশন দিতে পারবে না। সেনারা বিদ্রোহ করবে। বিশ্বাসঘাতক হবে। এ জন্যই তিনি বলেছেন, ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বিশ্ব অটল থাকে। রাষ্ট্র অটল থাকে। কোন রাষ্ট্র যদি অন্যায় শুরু করে, মনে করবেন এর পতন অবশ্যম্ভাবী।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব মানুষের একটি প্রকৃতিক গুণ

ইবনে খালদুন আলোচনা করছিলেন, মানবসভ্যতা নিয়ে। তিনি বলেন, সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের জন্য আবশ্যক। দার্শনিকরা এই সত্যটি প্রকাশ করে বলেছেন: "Man is political by nature" অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক। অর্থাৎ সমাজবদ্ধ না হয়ে সে থাকতে পারে না। মানুষ হলো সামাজিক জীব। সমাজেই তাকে বসবাস করতে হয় এবং সমাজের বিভিন্ন শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে হয়। এখন এমন কোন প্রতিষ্ঠান, অর্গানাইজেশন বা ব্যক্তি যদি তার অনুসারীদের সমাজের এই ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত না করে, কিংবা জড়িত হতে বাঁধা দেয়, তাহলে মনে করতে হবে যে, তারা মানুষের মানবিকতার বিরুদ্ধে বা মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

কারণ এভাবে তো বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে সামাজিক হতে হবে। তাকে রাজনীতি, সমাজসেবা, ব্যবসা, শিল্প-সংস্কৃতিতে জড়িত হতে হবে। তাই কোন শিক্ষবিদ রাজনীতিকে বাঁকা চোখে দেখতে পারেন না। তবে অবশ্যই রাজনীতির ধরনে ভিন্নতা থাকতে পারে বা থাকবে। ইবনে খালদুন বলেন, "This is what civilization" অর্থাৎ সভ্যতার অর্থ এটিই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা মানুষের গঠন এমন এক রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং সাজিয়েছেন যে, সে কেবলমাত্র খাদ্যের সাহায্যে বেঁচে থাকতে পারে। তিনি মানুষকে খাদ্যের প্রতি স্বাভাবিক আকাঙ্খা দিয়ে তৈরি করেছেন। এবং তাকে এমন শক্তিও প্রদান করেছেন যার মাধ্যমে সে এটি অর্জন করতে পারে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য এককভাবে সংগ্রহ করতে একজন মানুষের একক যে শক্তি রয়েছে, সেটা যথেষ্ট নয়।

একদিনের ন্যূনতম ও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের কথাই ভাবুন। এর প্রস্তুতির সাথে অনেক শিল্প জড়িত। চাল প্রস্তুত করার প্রসেস। বিজ বপন থেকে নিয়ে প্লেইটে আসা পর্যন্ত। তারপর যে প্লেটেই খাওয়া হচ্ছে বা চাল সিদ্ধ করা হচ্ছে তা তৈরিতে কী কী শিল্প জড়িত? শুধু ভাত প্রস্তুত করতেই অনেক মানুষের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের অধীনে কাজে লাগাতে হয়। যা অবশ্যই এক-দুজনের জন্য আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। খাদ্যের জন্য যেমন, ঠিক তেমনি প্রতিটি ব্যক্তির তার প্রতিরক্ষার জন্য অন্য মানুষের সাহায্য প্রয়োজন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয় তাআ'লা অনেক প্রাণীর মধ্যে এমন নিখুঁত ক্ষমতা দিয়েছেন, যা মানুষের গঠনের মধ্যে নেই।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘোড়ার শক্তি মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি। গাধা বা একটি বলদের শক্তিও। সিংহ বা হাতির শক্তিও মানুষের শক্তির চেয়ে বহুগুন বেশি। প্রাণীর মধ্যে আগ্রাসী প্রকৃতি স্বাভাবিক। আর তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা প্রত্যেক প্রাণীকে নিজেদের রক্ষার জন্য একটি বিশেষ অঙ্গ দিয়েছেন। মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা দিয়েছেন চিন্তার ক্ষমতা ও হাত। চিন্তার সক্ষমতার সাহায্যে হাতের মাধ্যমে মানুষ শিল্প তৈরি করে। অন্যান্য প্রাণীরা নিজেদের

নিরাপত্তার জন্য যে সব অঙ্গ ব্যবহার করে, তার পরিবর্তে মানুষ শিল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্র তৈরি করে তা দিয়ে নিজেদের রক্ষা করে।

যেমন আঘাত করার জন্য নখের পরিবর্তে তরবারি ও আঘাত প্রতিহত করার জন্য গাঢ় চামড়ার পরিবর্তে ঢাল ব্যবহার করা। একজন মানুষের একক সক্ষমতা একটি বোবা প্রাণীর শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে সেটা যদি হয় কোন শিকারি প্রাণী। তাছাড়া একজনের পক্ষে প্রতিরক্ষার সবরকমের সরঞ্জাম যোগাড় করাও অসম্ভব। কারণ দুনিয়ায় অসংখ্য প্রাণী বিদ্যমান। এজন্য অসংখ্য শিল্পের প্রয়োজন রয়েছে। আর তাই মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে, সে অন্যান্য মানুষের সাহায্য নেবে। কো-অপারেশন করবে। যতক্ষণ না এ ধরনের কোনও কো-অপারেশন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোন খাবার বা পুষ্টি অর্জন করতে পারে না।

খাদ্য ছাড়া জীব বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাকে এমনভাবে তৈরিই করেছেন যে, বেঁচে থাকতে হলে তার অবশ্যই খাবার লাগবে। এমনিভাবে, অস্ত্রহীনতা তাকে নিরাপদ রাখে না। সে বিভিন্ন প্রাণীর শিকারে পরিণত হয় ও সময়ের অনেক আগেই মারা যায়। অবস্থা এমন হলে মানব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইবনে খালদুনের মতানুসারে অস্ত্রধারী মানুষই মানবতার সুরক্ষাকারী। অস্ত্রহীন মানুষ মানবতার ধ্বংস ঢেকে আনে। বর্তমান সময়কালে আমরা দেখছি কর্পোরেট দুনিয়ার নিয়ন্তারা মানুষকে অস্ত্রহীন ফার্মের পশুর মতো বানিয়ে রেখেছে তাদের কর্পোরেশন চালানোর জন্য। মানুষ তাদের অস্ত্র হারিয়ে স্বাধীনতা হারিয়েছে। নিজেদের প্রতিরক্ষা দিতে না পেরে আরেক মানুষ নামক পশুর শিকার হিসেবে দিনাতিপাত করছে।

যখন পারস্পরিক সহযোগিতা বিদ্যমান থাকে, তখন মানুষ তার পুষ্টির জন্য খাদ্য এবং তার নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র অর্জন করে। যার মাধ্যমে মানবজাতির বেঁচে থাকার হিকমাহ বাস্তবায়িত হয়। আর তাই মানবজাতির জন্য সমাজবদ্ধতা ও সামাজিক সংগঠন প্রয়োজন। তা না থাকলে মানুষের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মানুষের মাধ্যমে পৃথিবী আবাদ করা ও মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে থাকার আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। এটিই সভ্যতার অর্থ। এ নিয়েই আমাদের আলোচনা। আল্লাহ তাওফিক দিন।

মানবজাতি যখন সমাজবদ্ধ হয় ও সামাজিক সংগঠন অর্জন করে। যেমনটি আমরা বলেছি। এবং যখন পৃথিবীতে সভ্যতা তৈরি হয়ে যায়, তখন তাদের এমন কারো প্রয়োজন পড়ে যে মানুষের প্রভাব প্রতিপত্তি, আগ্রাসনকে সংযত করে রাখবে। কারণ আগ্রাসন এবং অবিচার মানুষের প্রাণী প্রকৃতিতে রয়েছে। বোবা প্রাণীদের আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য যে অস্ত্র তৈরি করা হয়েছে, সেটা মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হয় না। কারণ সকল মানুষেরই অধিকারে তা রয়েছে। সুতরাং, মানুষকে একে অপরের আগ্রাসন থেকে বেঁচে থাকতে হলে অন্য কিছু একটার বা কারো প্রয়োজন পড়ে। যেহেতু মানুষ সকল প্রাণী থেকে উত্তম, তাই সেই ‘অন্য কেউ’ মানুষের মধ্য থেকেই আসতে হবে।

যিনি মানুষকে আগ্রাসী হতে বাঁধা দেবেন, আগ্রাসন নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাকে অবশ্যই মানুষের মধ্য থেকে কেউ একজন হতে হবে। যিনি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে হবেন শ্রেষ্ঠ। যাতে করে কেউ কারো উপর অন্যায় আঘাত করতে না পারে। এটিই হলো রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অর্থ। এভাবে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব মানুষের একটি প্রাকৃতিক গুণ যা মানবজাতির জন্য সম্পূর্ণরূপে জরুরি একটি বিষয়।

প্রাচুর্যতা দ্বীন পালনকে বাধাগ্রস্ত করে

প্রতিটি পর্বের মতো এই পর্বেও আমরা ইবনে খালদুনের চিন্তাকে আমাদের সময়কালের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। অনেক সময় খালদুনের লেখায় শুধু মরুভূমি শব্দ ব্যবহার করা হলেও আমি এর সাথে গ্রামীণ শব্দ যুক্ত করেছি এবং খাবারের আলোচনায় ভাত যুক্ত করেছি। এভাবে প্রসঙ্গিক শব্দ ও বাক্যাংশ যুক্ত করেছি প্রয়োজনমত। এটা সরাসরি অনুবাদ নয়। যদিও আমি মূলত উনার চিন্তাকেই আমার মত করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। উনার আইডিয়াকে আমি আমার মধ্যে ইচ্ছেমত ডানা মেলার সুযোগ করে দিয়েছি।

ইবনে খালদুন আলোচনা করছিলেন, বিভিন্ন অঞ্চলভেদে খাবারের প্রাচুর্যতা এবং ঘাটতির ভিন্নতা নিয়ে। এবং সেটা কীভাবে মানবদেহ এবং এর চরিত্রকে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন, সকল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে খাবার থাকে না। বা সকল এলাকার বাসিন্দাই আরামদায়ক জীবনযাপন করে না। কিছু অংশে বাসিন্দারা প্রচুর শস্য, মৌসুমী গম এবং ফল উপভোগ করেন। কারণ মাটি গাছগুলির পক্ষে সুষম এবং অনুকূল। আর তাই ঐসব স্থানে বিস্তৃত সভ্যতা গড়ে উঠে। অন্যদিকে, অন্যান্য এলাকায় জমি থাকে পাথুরে। সেসব স্থানে কোন বীজ বা গুল্ম একেবারেই বৃদ্ধি পায় না।

সেখানকার বাসিন্দাদের খুব কঠিন জীবন পার করতে হয়। এই জাতীয় জনবসতির উদাহরণ যেমন হিজাজ এবং ইয়েমেনের বাসিন্দা। বা মাগরিবের (মরক্কো, মৌরিতানিয়া) মরুভূমিতে বসবাসকারী সম্প্রদায়। বা পরিত্যক্ত মরু অঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবর আরব। এদের সকলের কাছে শস্য, মসলা ইত্যাদি অপ্রতুল হয়ে থাকে। হ্যাঁ তারা পাহাড়ি এলাকার লোকদের থেকে তা সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু সেটা খুবই সামান্য হয়ে থাকে। একটি স্বাচ্ছন্দজনক জীবনের জন্য তা মোটেই পর্যাপ্ত হয় না।

ইবনে খালদুন বলেন: এত কমতি থাকার পরেও-

> “The desert people who lack grain and seasonings are found to be healthier in body and better in character then the hill people who have plenty of everyting. Their complexions are clearer, their bodies cleaner, their figures more perfect, their character less intemperate, and their minds keener as far as knowledge and perception are concerned.”

অর্থাৎ, তা সত্ত্বেও, মরুভূমির লোকেরা যাদের শস্য এবং মসলা ইত্যাদির অভাব রয়েছে, তারা

পাহাড়ের লোক যাদের সবকিছু আছে তাদের চেয়ে সুঠামদেহের অধিকারী এবং চারিত্রিকভাবে ভাল হয়ে থাকে। তাদের সুন্দর অবয়ব, তাদের দেহ পরিস্কার, তাদের দেহগঠন হয় আরও নিখুঁত। তাদের চরিত্রে উগ্রতা কম থাকে। এবং জ্ঞান বুদ্ধি, কমনসেন্স ও পারসেপশনে তারা অনেক বেশি সচেতন হয়ে থাকে।”

সাধারণভাবেই আমরা দেখি গ্রামের মানুষদের মধ্যে এরকম কোয়ালিটি বেশি থাকে। তারা সহজ সরল হয়। এবং তাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রখর হয়ে থাকে। যে এলাকায় শহরের আবহাওয়া যতো কম লেগেছে, মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধতা ততো বেশি বজায় থেকেছে। শহরের দূষিত বাতাস উক্ত বাসিন্দাদের মন মগজে কম দূষণ লাগাতে পেরেছে। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে এর প্রভাব দেখা যায়। সেই ব্যক্তি কোন আমির হোক বা গরীব, নেতা কিংবা অনুসারী, আলেম কিংবা সাধারণ মানুষ। মরক্কোর একটি ঘটনা আমি আপনাদেরকে বলি।

২০১৭ সালে মরক্কো সফরে গিয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য। তো ভাবলাম, একটা সফর করবো এককালের মুরাবিতুনদের শহর যাগুরাতে। এককালে পাহাড়ের ঐপাশের মরুভূমি থেকে রুক্ষ মরুচারীরা উঠে এসে দখল করে নিয়েছিল আরাম আয়েশে থাকা এ পাশের মানুষের ভূমি। দীর্ঘ যাত্রায় ওয়ারজাজাত হয়ে যাগুরা পৌঁছাতে বেশ ঝাক্কি পোহাতে হয়েছিল। কিন্তু যাত্রাপথে ও শহরে চলাফেরায় মানুষের আচরণ এইসব ঝাক্কি ঝামেলাকে বাতাসে মিলিয়ে দেয়। ভাবছিলাম, মানুষ এতো সহজ সরল ও ভালো হয় কীভাবে? মরুভূমির পাশের একটি শহরে সম্পূর্ণ একা ও অপরিচিত। কিন্তু কখনো অনিরাপত্তাবোধ জাগ্রত হয়নি। মনে হল এমন অনেক স্থান আছে যেখানে বিদেশি কাউকে প্রটেকশন ছাড়া পেলে মানুষ ছিড়ে-খুরে খেয়ে ফেলতো। কমপক্ষে ছিনতাই তো হতোই।

এই মরক্কোতেই ২০২০ সালের প্রথম দিকে পরিবার নিয়ে গিয়েছিলাম। মারাকেশ থেকে আওজুদ ড্রাইভ করছি। পথে মরুভূমি ও এটলাস পর্বতমালা। দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালানোর পরে ভাবলাম এক জায়গায় বসে কিছুটা জিড়িয়ে নেই। চারিদিকে পাহাড়-পর্বত। কিছুক্ষণ পরে যখন গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিলাম, স্টার্ট হলো না। গাড়ি কোনো আওয়াজই করছে না। মহা-বিপদ। মনে হচ্ছিল জনমানবহীন এক স্থানে আটকে গেছি। হঠাৎ এক দু'টি গাড়ি যাচ্ছে। পেছনে যে বাজার ফেলে এসেছি, মনে পড়ে সেটা বেশ দূরে হবে। পর্বতঘেরা এক নির্জন রাস্তায় একজন বিদেশি আটকে গেছে, সেখানে অনেক দূর্ঘটনার আশংকা রয়েছে।

গাড়ি স্টার্ট করার কোনো উপায় না পেয়ে হেজার্ড লাইট জ্বালিয়ে হাত তোললাম। একটা গাড়ি আসছে। আমার হাত তোলা দেখে থেমে গেল। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। সাথে কয়েকজন প্যাসেঞ্জার। উনি গাড়ি চেক করে বললেন, গাড়ির পেছনে ধাক্কা দেয়ার জন্য। উনি স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করবেন। গাড়িতে প্যাসেঞ্জার হিসেবে থাকা যুবক ও মুরব্বিরা ধাক্কা দিলেন। ঐ ট্যাক্সি ড্রাইভার আরো একটি ছোট মিনিবাস থামিয়ে ড্রাইভারকেও ধাক্কা দেয়ায় শরীক করলেন। আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, ট্যাক্সি ড্রাইভার নিজের পরবর্তী ট্রিপের কথা চিন্তা না করে আমাকে সাহায্য করছেন। সাথে প্যাসেঞ্জাররাও কেউ বলছেন না যে, উনাদের কাজ আছে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে, এখানে সময় নষ্ট হচ্ছে ইত্যাদি।

গাড়ি স্টার্ট হওয়ার পর আমি ঐ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে এর জন্য টাকা অফার করি। কিন্তু তিনি সেটা নেননি। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, তাকে টাকা অফার করতেই লজ্জা লাগছিল। এই ঘটনা আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে। বুঝেছিলাম মানবতা এখনো বেঁচে আছে। মরুভূমির প্রান্তে বসবাসকারী এইসব লোকেরা শহরের দূষণ থেকে মুক্ত আছে। তারা হিংস্র নয়, মানবিক। বাজার-সদাই করতে অনেক

দূরের বাজারে তাদেরকে যেতে হয়।

শহরের লোকদের মতো ফ্লাটের নিচে সবধরনের খাবারের মজুদ নেই। সুতরাং তাদের খাবারের পরিমাণ হয় স্বল্প। এতে করে তাদের শরীর ও গঠনের সাথে সাথে মনও অসুন্দরভাবে গড়ে উঠে না। ভুঁড়ি বের হয়ে নাদুস-নুদুস অবয়ব ধারণ করে না। বা অন্তর কুৎসিত রূপ নেয় না।

আর তাই ইবনে খালদুন বলেছেন: "প্রচুর পরিমাণে খাবার এবং এতে থাকা আর্দ্রতা দেহে ক্ষতিকারক পদার্থ তৈরি করে। দেহকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রশস্ত করে। অনেক প্রকারের ধাতুর জন্ম হয়। ফলে তা একটি ফ্যাকাশে বর্ণের অসুন্দর দেহগঠন তৈরি করে। একজন ব্যক্তির শরীরে অতিরিক্ত মাংস থাকায় সেটা হয়ে থাকে।" ইবনে খালদুন বলেন:

"When the moisture with its evil vapours ascends to the brain, the mind and the ability to think are dulled, The result is stupidity, carelessness, and a general intemperance."

"যখন এই আর্দ্রতা তার অশুভ বাষ্পসহ মস্তিষ্কে আরোহণ করে, চিন্তা করার ক্ষমতা তখন হ্রাস পায়। মন মগজ নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। ফলাফল হলো বোকামি, অসতর্কতা এবং সাধারণভাবে অসংযমতা।" বিলাসিতায় লিপ্ত মানুষের চিন্তার ক্ষমতা কীভাবে হ্রাস পায় সেটা আমরা বর্তমানের সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাবো। সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলাম। তারা সবসময় সাধারণই থাকেন। কিন্তু চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবি ও সমাজের নেতৃস্থানীয়দের ব্যাপারে একটু ভাবুন। যাদেরকে শিক্ষিত ভাবা হয়, তাদের চিন্তার অক্ষমতা ভাবিয়ে তুলে।

যেমন ২০২১ ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক জিয়া হাসানের ব্যাপারটাই ধরুন। তিনি নিজেকে মুসলিম দাবি করেছেন। অথচ সালাম নিয়ে করা তার মন্তব্য থেকে যতটুকু বুঝা গেল ইসলামের প্রাথমিক ধারণাটাও তার মধ্যে নেই। ধরে নিলাম, ইচ্ছে করেই স্টাডি করেননি। কিন্তু একজন ব্যক্তিত্ববান ও গবেষণায় থাকা ব্যক্তি কোনো একটি বিষয়ে বেফাঁস, শোনা কথা হুট-হাট করে বলে দিতে পারেন না। যদি না তার চিন্তার ক্ষমতা লোপ পেয়ে থাকে। নির্বোধের মতো মন্তব্যও করতে পারেন না। দেশের সর্বোচ্চ একটি বিদ্যাপিঠের একজন শিক্ষকের যদি এই দশা হয়ে থাকে তাহলে ছাত্রদের, সাংবাদিকদের ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের কী দশা হতে পারে! চিন্তার ক্ষমতা হারিয়েছেন লাক্সারি ও আরাম আয়েশে থাকা আমাদের অনেক দাঈরা। তারা অনেকেই ইসলামের কথা বলেন, কিন্তু চিন্তা করে বলেন না। বরং শুধুই বাতাসে ঘুরে বেড়ানো ন্যারেটিভ রিপিট করে যান।

একজন দাঈর কাছে একসেস পেতে যখন বিশাল অংকের টাকা খরচ করতে হয়। একটি সেলফি তুলতে বিশাল ধাক্কাধাক্কি করতে হয়। দাঈ কোথাও ওয়াজে গেলে হাজার হাজার টাকা দিয়ে বুকিং দিতে হয়। হেলিকপ্টারে আনতে হয়। বিজনেস ক্লাসে টিকেট দিতে হয়। দামি হোটেলে রাখতে হয়। দামি রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার এনে দিতে হয়। শিডিউল মেনে চলতে হয়। যখন দাওয়াতের চেয়ে সেলিব্রেটি শোডাউন বেশি হয়, তখন বুঝাই যায় যে, দাঈ অনেক লাক্সারিতে আছেন। আর ইবনে খালদুন যেমন বলেছেন, লাক্সারিতে থাকা লোকের চিন্তার ক্ষমতা লোপ পায়। ঠিক তাই আমরা দেখছি।

সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও মুখরোচক খাবার খেয়ে খেয়ে বর্তমানকালের ছোট-বড় দাঈদের চিন্তার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। তারা উপরে যাই দেখেন সেটাই রসিয়ে বর্ণনা করে যান। এমন বর্ণনা যা তাদের লাক্সারিতে প্রভাব ফেলতে পারে, সেটা তারা করেন না। আর কেনই বা তারা এমন চিন্তা করতে যাবেন, যে চিন্তা

তাদের সুস্বাদু খাবার পেতে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে। আবার কেউ চিন্তা করতে নেমে পড়ে মগজে থাকা দূষিত আর্দ্রতার কারণে কনস্পাইরিসি থিওরি বা অযৌক্তিক ও অপ্রমাণিত তথ্যের ভোক্তা ও প্রবক্তা হয়ে যান। নির্বোধের মতো কাজ করে বসেন। এই যেমন ধরেন, কুরআন ও সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াস এইসবের নীতির আলোকে প্রতিষ্ঠিত একটি সত্য বিষয়কে হয়তো এমন একজন দাঈ অস্বীকার করে বসলেন। বা এর বিপরীতে কাজ করলেন, যা সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে ধরছে না।

প্রশ্ন হলো কেন, কীভাবে একজন জ্ঞানী ও দাঈ এমন করতে পারেন? এর উত্তর ইবনে খালদুনের কথাগুলো। এবং এসবই এর বাস্তব প্রমাণ দেয়। তাদের এই নির্বুদ্ধিতা প্রাকৃতিক। সুস্বাদু খাবার আর লাক্সারিতে যারা ডুবে দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের মগজে যখন এইসব খাবারের দূষিত বাতাস পৌঁছে, তখন তারা নির্বোধের মতো কথা বলেন, বা কাজ করেন। দেখবেন, পরিষ্কার দলীলকে মাসলাহা-মাফসাদার দোহাই দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। খালদুন বলেছেন, আমরা দেখতে পাই যে, উর্বর অঞ্চলগুলির বাসিন্দারা যেখানে কৃষিজাত পণ্য এবং পশুপালনের পাশাপাশি মৌসুমি ফল ও মসলা প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে- এর বাসিন্দারা সাধারণত চিন্তায় নির্বোধের ও গঠনে অসুন্দর হয়ে থাকে। প্রচুর পরিমাণ খাবার যেমন শরীরে দূষিত পদার্থ তৈরি করে শরীরের ক্ষতি করে, বিপরীতে ক্ষুধা ব্যাপকভাবে শরীর ও এর গঠনের উন্নতিতে সাহায্য করে। আর তাই শহরের লোকদের চেয়ে গ্রামের, মরুভূমির লোকেরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিকভাবে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। তাদের প্রধান খাবার হয়ে থাকে মাংস ও চিকেন। যাতে তারা মাখন ব্যবহার করেন না। এ কারনে তাদের খাবারের আর্দ্রতা থাকে সামান্য, এবং এটি তাদের দেহে কেবলমাত্র কয়েকটি ক্ষতিকারক বিষয় আনতে পারে।

ফলস্বরূপ, কঠোর জীবনযাপনকারী মরুভূমির বাসিন্দাদের তুলনায় শহুরে জনগোষ্ঠী অত্যন্ত নাজুক হয়ে থাকে। অন্যদিকে মরুভূমি ও গ্রামের যে সমস্ত বাসিন্দা ক্ষুধার্ত থাকাতে অভ্যস্ত, তাদের শরীরে কোনো অতিরিক্ত মেদও দেখা যায় না। এটা জানা উচিত যে, দেহের উপর প্রাচুর্যের যে প্রভাব সেটা এমনকি দ্বীনের ক্ষেত্রে ও ধর্ম-কর্ম পালনেও প্রভাব ফেলে। মরুভূমি ও এমন বসতির লোক যারা সংযত জীবনে অভ্যস্ত এবং যারা উপোস থাকা ও আরামদায়ক জীবন থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখাটাকে অভ্যাসে পরিণত করেছে, তাদেরকে দেখা গেছে প্রাচুর্যে বসবাসকারী লোকদের চেয়ে বেশি ধার্মিক ও দ্বীনের বাণী গ্রহণে বেশি প্রস্তুত থাকেন।

এ কারণে দেখা গেছে যে, শহর এবং নগরে খুব কম ধর্মীয় মানুষ থাকেন। কারণ সেখানে বেশিরভাগ লোকই স্বচ্ছল ও অসতর্ক। যারা প্রচুর মাংস, মসলা ও মিহি আটা-ময়দা (চাল) খেয়ে থাকেন। তাই ধার্মিক পুরুষ এবং তপস্বীদের অস্তিত্ব মূলত (গ্রাম) ও মরুভূমিতেই সীমাবদ্ধ, যার বাসিন্দারা খাবারে থাকে সংযত। এমনিভাবে, একই শহরের মধ্যকার বাসিন্দাদের বিলাসিতা এবং প্রাচুর্যের ভিন্নতার কারণে অবস্থার ভিন্নতা হতে পারে। এটিও লক্ষ্য করা যায় যে, সেইসব লোক যারা প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে এবং যাদের সকল প্রকার ভালো ভালো জিনিস খাওয়ার সুযোগ থাকে, তারা মরুভূমি বা শহরের বাসিন্দা হোক সেটা ধর্তব্য নয়, কোন দুর্ভিক্ষ বা মহামারি আসলে অন্যদের আগে তারা দ্রুতই মারা যায়।

বর্তমান পরিস্থিতির কথাই ভাবুন না একটু। করোনার কারণে যাদের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল তারা মারা গিয়েছেন দ্রুত। খাবারে যারা একেবারে সিম্পল থাকেন যেমন শুধু খেজুর আর পানি, বা শুধুই বার্লি বা যব এবং অলিভ অয়েল ইত্যাদিতে নিয়ন্ত্রিত থাকেন তারা শারীরিকভাবে শক্তিশালী হয়ে থাকেন। যখন খরা বা মহামারি আঘাত হানে, তখন তা প্রাচুর্যে থাকা লোকদের মতো তাদেরকে সেভাবে মেরে ফেলতে পারে না।

গ্রামের লোকেরা শহরের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন

প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা সকল ক্ষেত্রে শহরের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে ইবনে খালদুন আলোচনা করেছেন বেদুঈন বা গ্রামে বসবাসকারী লোকদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। কারণ তারা প্রকৃতির আহ্বানকে দূরে ঠেলে দিতে পারেন না। কঠোর-কঠিন, কর্কশ, জীবন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। দূর্গম এলাকা তাদের এমন কিছু অফার করে যা বসতি এলাকা অফার করতে পারে না। তাদের খাবার, বাসস্থান ও জীবনযাত্রার মান প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় না। কারণ পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত কিছু তারা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন না।

কিন্তু অবস্থার কিছু উন্নতি হলে, সম্পদের পরিমাণ বাড়লে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দ্যতা পেলে তারা কিছুটা আয়েশি হয়ে উঠে। এসময় তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের জন্য পরস্পরের সহযোগিতা নিতে থাকে। এমতাবস্থায় তারা বেশি কাপড় ও খাবার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সবকিছুর অতিরিক্ত ব্যবহারে তারা গর্ব করে। তারা বড় বড় বাড়ি বানাতে থাকে। শহর-নগরের গোরাপত্তন করে। এতে তারা আরো বেশি আয়েশি, সুখী জীবনের স্বাদ পায়। ধীরে ধীরে সেটা অন্যতম একটি বিলাসী রীতিনীতিতে পরিণত হয়। তাদের জন্য সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, ভাল ভাল খাবার ও চমৎকার বাহারি পোশাকের প্রস্তুতি নেয়া। ভাল রেস্টুরেন্টে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করা খাবারটায় তারা বিরাট গর্ব অনুভব করে। ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি, লেবানিজ, শুশি ইত্যাদি কুজিন খাওয়ায় মত্ত হয়ে যায় তারা।

টিভি চ্যানেলগুলোতে কে ভাল খাবার তৈরি করতে পারে সে নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। চমৎকার ডিজাইন ও সূক্ষ্ম কারুকাজের কাপড়ের কালেকশনে আত্মসম্মান বাড়িয়ে দেয়। পোশাকের কারুকার্য ডিজাইন উপস্থাপনে ক্রিয়েটিভ মাইন্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বড় বড় টাওয়ার ও বিল্ডিং তৈরি করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনে সেসব বিল্ডিংগুলো সাজানো হয়। চলে নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরির প্রতিযোগিতা। বর্তমানে আমাদের সময়কালে আমরা এই বিষয়গুলো দেখতে পাই। সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ডিজাইন উপস্থাপনের প্রতিযোগিতা, নাশিদ প্রতিযোগিতা, খাবার তৈরির প্রতিযোগিতা চলে। বিনোদনের এইসব ক্ষেত্রে বিজয়ীদেরকে বীর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বর্তমানে বলা হয়ে থাকে আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে উন্নত সময়কালে বসবাস করছি।আসলে সেটা সঠিক নয়। বরং আমরা একটি সভ্যতার পতনের সময়কালে বসবাস করছি। একটি সভ্যতার ক্ষয় প্রত্যক্ষ করছি। এর সাক্ষ্য পরবর্তী

জেনারেশন দেবে।

যেহেতু বেদুঈন ও গ্রামবাসীরাই একসময় ভোগবাদি শহুরে জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তাই তারা শহুরে লোকদের পূর্বে আসেন। পূর্বতন গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হন। মরুভূমি, প্রত্যন্ত অঞ্চল হলো সভ্যতার, শহর-নগরের ভিত্তি। এখানেই সেগুলো সুরক্ষিত থাকে। আমরা উল্লেখ করেছি প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা তাদের জীবনযাত্রার মান নিতান্তই প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। আর চাইলেও তারা এরচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। অন্যদিকে শহরের অধিবাসীরা সবসময় উদ্বিগ্ন থাকেন তাদের আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা নিয়ে। আর তাই খালদুন লিখেছেন:

“The bare necessities are no doubt prior to the conveniences and luxuries.”

অর্থাৎ, সন্দেহ নেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী, সুযোগ-সুবিধা ও বিলাসিতার আগে আসে। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস হল মৌলিক। এবং বিলাসিতা গৌণ, পরে আসে। এজন্যই বেদুঈন বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা হল ভিত্তি এবং তারা শহুরে ভোগবাদি লোকদের পূর্বে আসেন।

মানুষ প্রথমে মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির সন্ধান করে। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অর্জনের পরেই কেবল তার পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসিতার নাগাল পাওয়া সম্ভব হয়। শহুরে জীবনের কোমলতার পূর্বে থাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কঠোর জীবন। এ কারণে বেদুঈন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকদের লক্ষ্য থাকে নগরায়ন। তারা সেই লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। যখন তারা বিলাসিতার সামগ্রী অর্জনের, ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করেন তখন “he enters upon a life of ease and submits himself to the yoke of the city.”

তখন তারা এক কোমল, আরামদায়ক জীবনে পদার্পণ করেন এবং নিজেদেরকে শহরের বিলাসিতা ও আরাম আয়েশের গোলাম বানিয়ে নেয়। এজন্য গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকদের মধ্যেই প্রকৃতির সাথে বেশি সম্পর্ক দেখা যায়। তারা অকৃত্রিম হয়ে থাকেন। বিপরীতে শহরের লোকেরা হয় কৃত্রিম। মানুষের সহজাত গুণ আস্তে আস্তে খসে পড়তে থাকে। মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তারা হন ভঙ্গুর, ফ্রাজাইল। এ অবস্থায় তাদের ধীরে ধীরে আরো অধঃপতন হতে থাকে। কারণ শহরের লোকেরা বেদুঈন বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক জীবনে ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছা পোষণ করেন না। তবে জরুরি প্রয়োজন পড়লে, সেটা ভিন্ন কথা। ইবনে খালদুনের মতে মানুষ তার আদি, গ্রাম্য জীবন থেকে উন্নতি করে করে এক সময় শহরের চূড়ান্ত বিলাসিতায় পৌঁছে। সেখান থেকেই তাদের পতন শুরু হয়। এমতাবস্থায় নতুন আরেক দল লোক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উটে আসে। তারা শহরের নাজুক অধিবাসীদের পরাজিত করে নতুন সভ্যতার গোরাপত্তন করে। এভাবে এই চক্রে চলতে থাকে। প্রশ্ন জাগে, শহরের মানুষদের এই ক্ষয় ও পতন ঠেকানোর কি কোন রাস্তা নেই? এর সামাধান কি?

এর সমাধান ইসলাম দিয়েছে। দেখুন ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত একটি হাদিস।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذُلّا لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

অর্থাৎ, “যখন তোমরা অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হবে, গবাদিপশুর লেজ ধরে থাকবে, চাষাবাদেই

তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, দ্বীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত যা তিনি অপসারণ করবেন না।”

এই হাদিসে দেখতে পাই, বলা হচ্ছে, যখন চাষাবাদ ও গবাদিপশুর লেজ ধরে থাকবে। এবং তাতেই তুষ্ট থাকবে। আর জিহাদ ছেড়ে দেবে।

অর্থাৎ, নগর জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার পর, জিহাদের মাধ্যমে যে প্রত্যন্ত, গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা নেয়ার কথা ছিল তা থেকে নিজেকে যখন কেউ বঞ্চিত করবে তখন সে সেই চক্রে পড়বে যাতে সকল সভ্যতার লোকেরা পড়েছিল। জিহাদ ইসলামের এমন এক বিধান যার মাধ্যমে একজন মানুষ প্রাকৃতির সাথে, মনুষ্যত্বের অকৃতিম প্রকৃতির সাথে নিজেকে পরিচয় করাতে পারে। এভাবে একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই নগরের সভ্যতা ও গ্রামের জীবনের স্বাদ একসাথে গ্রহন করা।

সেটা যতক্ষণ চলবে, এই অভিজ্ঞতা যতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে তা সে জনগোষ্ঠীকে ক্ষয় ও পতনের হাত থেকে রক্ষা করে যাবে।

বেদুঈন বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা নগরের বাসিন্দাদের চেয়ে স্বভাবগত ভালোর কাছাকাছি হয়ে থাকেন। এর কারণ হলো তাদের অন্তর মানুষের স্বভাবজাত অবস্থায় থাকে।

“the soul in its first natural state of creation is ready to accept whateaver good or evil may arrive.”

অর্থাৎ, আত্মার সৃষ্টির পর তার প্রাথমিক অবস্থায় যা কিছুই ভাল বা মন্দ আসবে তা সে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত থাকে। রাসূল সাঃ বলেছেন,

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه

প্রতিটি শিশু প্রাকৃতিক (ফিতরাহ) অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা-মাতারা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান বা বিধর্মী করে তোলে।

অর্থাৎ, অন্তরে প্রথমে দু'টি গুণের একটির দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং অন্যটি থেকে দূরে সরে যায়। পরবর্তীতে তার পক্ষে সেই গুণ অর্জন করা কঠিন হয়ে যায়। একজন ভাল মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যখন ভাল গুণগুলো প্রবেশ করে, ভাল অভ্যাস গড়ে উঠে, তখন সে মন্দ অভ্যাস থেকে দূরে সরে যায়। তার পক্ষে পরবর্তীতে মন্দকে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি কারো মধ্যে যখন মন্দ গুণ প্রবেশ করে। খারাপ অভ্যাসে পরিণত হয়। সে ভাল থেকে দূরে সরে যায়। তার পক্ষে তখন ভাল গুণ অর্জন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে বিভিন্ন চিন্তাধারার মাধ্যমে পরিক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য মতাদর্শের জঞ্জাল তার ভেতরে প্রবেশ করে। এজন্য দাওয়াহর জন্য তরুণ-যুবকদের টার্গেট করা সবচেয়ে উপযুক্ত পছন্দ। কারণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন লোকের ভেতরের জঞ্জাল দূর করতে যে সমস্যা ফেইস করতে হবে, সেটা একজন তরুণ, ফ্রেশ মানবকে দাওয়াতে ফেইস করতে হবে না। এইজন্য কোন বিপ্লবের পথে কর্মী সংগ্রহের টার্গেট হওয়া উচিত তরুণ প্রজন্ম।

এবং বিপ্লবের মাঠপর্যায়ের ক্ষেত্র হিসেব প্রত্যন্ত অঞ্চলকে পছন্দ করা হবে অত্যন্ত সুবিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত। কারণ ঐসব এলাকা ও এর বাসিন্দারা প্রকৃতির কাছাকাছি হওয়ায় বৈপ্লবিক মেসেজ তারা খুব

দ্রুত গ্রহণ করে নেয়। স্বাধীনচেতা, প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধাচরণের প্রকৃতি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় এটা সহজ হয়। আমরা আধুনিক ইতিহাসেও বিভিন্ন বিপ্লবের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, বিপ্লবিরা প্রত্যন্ত অঞ্চলকে তাদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে ভিয়েতনাম ও আফগান যুদ্ধকে পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

শহরের আয়েশি বাসিন্দারা তাদের ভোগবাদি ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন চিত্তরঞ্জন নিয়েই বেশী উদ্বিগ্ন থাকেন। বৈষয়িক লাভ-লোকসান, বিলাসিতা, সাফল্য নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এসব বৈষয়িক কাজ কারবার ও কামনা-বাসনার গোলামী তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এ কারণে তাদের মন-মগজ সকল প্রকারের দোষযুক্ত খারাপ গুণে গুণান্বিত ও রাঙায়িত হয়ে যায়। যতো বেশি তারা ভোগবাদি সভ্যতার ভোগ-বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়, সত্য-সুন্দরের পথ ও পদ্ধতি ততো বেশি তাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত তারা সংযমের সমস্ত ধারণা হারিয়ে ফেলে। এদের অনেককেই বিভিন্ন স্থানে অনুচিত ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায়। খারাপ মানুষের অবস্থা তো এটাই, যাদের মধ্যে সংযমের কোন বোধই থাকে না। এতে তারা বিরক্ত হয় না, খারাপও বোধ করে না। আজকাল তো অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে শহরের অনেক আয়েশি দায়ীরাই অনুচিত, অসংযমী, খারাপ ভাষা দাওয়াহর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে বসেন। এসব যেমন শ্রুতিকটু হয় তেমনি তা তাদের পতনোন্মুখ জীবনের অবস্থা উপস্থাপন করে আমাদের সামনে। ক্ষয় যখন শহরের লোকদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে ইসলাহ করা, ঘষে মেজে পরিষ্কার করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। আর স্পষ্টত এটা হওয়ারই কথা।

কারণ নগরের ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রা একটি সভ্যতার সর্বশেষ পর্যায়ের অবস্থান জানান দেয়। এই পর্যায় থেকেই এই সভ্যতার ক্ষয় ও পতন শুরু হয়। এছাড়া এই পর্যায়ে এসে মানুষের যে অবস্থা পৌঁছায়, তা খারাপের চুড়ান্ত মহড়া প্রদর্শন করে। ভাল থেকে দূরে আরো দূরে সরে যাওয়ার সর্বশেষ ধাপে অবস্থান করে তারা। এই কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকায় তাদেরকে ইসলাহ করা সহজ হয়। তবে এসব জেনে মন খারাপের কোন প্রয়োজন নেই। উত্তরণের পথ অবশ্যই আছে। ইবনে খালদুন বলেন:

> “Man is a child of the customs and the things he has become used to. He is not the product of his natural disposition and temperament. The conditions to which he has become accustomed, until they have become for him a quality of character and matters of habit and custom, have replaced his natural disposition. If one studies this in human beings, one will find much of it, and it will be found to be a correct observation.

মানুষ যে রীতিনীতি এবং জিনিষগুলিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে তার গোলাম। সে তার প্রাকৃতিক স্বভাব এবং মেজাজের ফসল নয়। যে পরিস্থিতিতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, সেটাই তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যাসে পরিণত হয়ে উঠে। এই অভ্যাস তার প্রাকৃতিক স্বভাবের স্থান গ্রহণ করে নেয়। যদি কেউ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে এটাই সঠিক পাবেন।” অর্থাৎ অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে একজন

মানুষের পক্ষে সম্ভব সকল কোয়ালিটি অর্জন করা। অলসতা ও আয়েশি জীবনযাত্রা মানুষের ক্ষয় ও পতনের প্রমাণ বহন করে। এভাবে চলতে থাকলে মানুষ তার ফিতরাত ও মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলতে থাকে। এমন মানুষের পক্ষে সংস্কার, বিপ্লব ও ভালোর পথে পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব নয়। কঠোর, কঠিন ও পরিমিত জীবনযাত্রা মানুষের অভ্যন্তরের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা, প্রাকৃতিক গুণাবলি জাগিয়ে তুলে। এবিষয়ে ইবনে খালদুন আরো অনেক আলোচনা করেছেন। সামনের আলোচনায় আমরা চেষ্টা করবো বিষয়টাকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে আনার।

আইনের উপর নির্ভরতা মনোবল ধ্বংস করে দেয়

অলস ও আয়েশি মানুষদের আইনের উপর নির্ভরতা তাদের মনোবল এবং ভেতরে থাকা প্রতিরোধের শক্তি নষ্ট করে দেয়। কেন এটা হয়? অথচ আইনের উপর নির্ভরতা মানুষকে আরো বেশি সুশৃঙ্খল, আরো বেশি শক্তিশালী করবে সেটা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তাকে কেন সেটা আরো দুর্বল করে তুলে? খেয়াল করলে দেখবেন, সকল মানুষ কিন্তু তার জীবনের সকল সিদ্ধান্ত নিজে নেয় না।

“man must by necessity be dominated by someone else.”

অর্থাৎ, মানুষের উপর কারো আধিপত্য থাকাটা বিশেষ জরুরি। আমরা দেখি এই আধিপত্য থাকে নেতাদের। নেতারা তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি এই domination বা আধিপত্য ন্যায্য ও যথাযথ হয় এবং এর অধীনে মানুষ বিভিন্ন আইন ও বিধি-নিষেধের মাধ্যমে নিপীড়িত না হয়, তবে একজন মানুষ তার নিজের মধ্যকার যে সুপ্ত সাহস বা কাপুরুষতা রয়েছে তার দ্বারা স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালিত হতে পারে। যেকোন ধরণের নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতার অনুপস্থিতি বা the absemce of any restraining power এর অনুপস্থিতিতেও সে সন্তুষ্ট থাকে।

এমতাবস্থায় নিজের উপর আস্থা, স্বনির্ভরতা বা Self-reliance একসময় তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু বিপরীতে যদি সে আধিপত্যটা হিংস্র ও ভীতিকর হয়, তখন তা মানুষের মধ্যে থাকা সকল মনোবল ভেঙে দেয়। তাদের মধ্যকার প্রতিরোধের শক্তি ভেঙে দেয়। ফলশ্রুতিতে নিপীড়নের শিকার লোকদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা তৈরি হয়।

যখন আইনকে নীপিড়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তা একজন মানুষের মধ্যকার মনোবলকে সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করে দেয়। কারণ এমন কেউ যে নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারে না, তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবহার সেই ব্যক্তির মধ্যে অপমান বা হিউমিলিয়েশনের অনুভূতি তৈরি করে।

আর নিঃসন্দেহে তা সেই ব্যক্তির মধ্যকার মনোবলকে ভেঙে দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এর অনুষাঙ্গিক নির্দেশাবলী মানার জন্য বিভিন্ন আইন-কানুন তৈরি করে। এবং শৈশব থেকেই এসব প্রয়োগ করা হতে থাকে। তখন সেসব আইনের কিছুটা হলেও একই প্রভাব থাকে। কারণ মানুষ এমতাবস্থায় ভয় ও কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে বেড়ে ওঠে। ফলস্বরূপ তারা তাদের নিজস্ব মনোবলের উপর আর নির্ভর করতে পারে না।

Thus, greater fortitude is found among the savage Arab Bedouins than among people who are subject to laws.

এজন্য বেদুইন আরবদের মধ্যে সর্বোচ্চ মনোবল দেখতে পাওয়া যায়। ভারত উপমহাদেশেও পাঠান বা পশতুনদের মধ্যে এই মনোবল দেখতে পাওয়া যায়। এইসব এলাকার ভৌগলিক অবস্থা ও তাদের অবস্থানের দুর্গমতার প্রভাবে এটা হয়ে থাকে। এজন্য যারা আইনের উপর ভরসা করে বসে থাকেন, প্রাথমিক জীবন থেকেই শিক্ষাক্ষেত্র, শিল্প-কারখানায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এইসব আইন, নিয়ম-কানুনের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে থাকেন। তারা তাদের মধ্যকার মনোবল অনেকাংশেই হারিয়ে ফেলেন। প্রতিকূল ও বিশৃংখল পরিস্থিতিতে তারা নিজেদেরকে কালেভদ্রে হেফাজত করতে পারেন। ছাত্র-শিক্ষক যাদের পেশা পড়ালেখা করা, শিক্ষাদান করা কিংবা ধর্মীয় নেতা, ইমাম যারা বিভিন্ন প্রকার নিয়ম-কানুন হরদম মেনে চলেন, তাদের অবস্থাও এমনই। লক্ষ্যণীয় যে, তাদের কাছে বিপ্লব আশা করা সঠিক হবে না। বিপ্লবের জন্য যে বিদ্রোহী মনোবল প্রয়োজন সেটা তাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। এই বিষয়টা এবং এটি কীভাবে প্রতিরোধের শক্তি এবং মনোবলকে ধ্বংস করে দেয় সেটা উপলব্দি করা আমাদের জন্য বেশ জরুরি।

সন্দেহ নেই, রাসূল সাঃ এর সাহাবারা ধর্মীয় আইন মেনে চলেছিলেন। তারপরেও তাদের মনোবলে কোন কমতি ছিল না। হ্রাসও পায়নি। বরং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মনোবল তারা ধারণ করতেন। মুসলমানরা যখন রাসূল সাঃ এর কাছ থেকে দ্বীন ইসলাম পেয়েছিলেন, তখন কুরআনের আদেশ-নিষেধ থেকেই তারা তাদের মনোবল পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যকার মনোবলকে ইসলাম আরো জাগিয়ে তুলেছিল। কারণ, আইন এসেছিল সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে। গতানুগতিক কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নয়। এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা মানুষের ভালমন্দের ব্যাপারে অবগত। রাসূল সাঃ এর মাধ্যমে পাওয়া ইসলামিক আইন তাই তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আমলে পরিণত করেছিলেন।

কিন্তু ধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়ার কারণে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ব্যবহারে এসেছিল। ইসলামী আইন-কানুন শিক্ষা একটি শিল্পে পরিণত হয়েছিল। জ্ঞান আহরণের অংশ হিসেবে তা প্রচলিত বিভিন্ন নিয়ম কানুনের আওতায় শিক্ষাদান শুরু হয়। মানুষ নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। তারা আইনের প্রতি আজ্ঞাবহতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে অনুগত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে। এভাবে তাদের মনোবল হ্রাস পেতে থাকে।

Clearly, then, governmental and educational laws destroy fortitude, because their restraining influence is something that comes from outside. The religious laws, on the other hand, do not destroy fortitude, because their restraining influence is something inherent.

স্পষ্টই আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকারী এবং শিক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলি মনোবল ধ্বংস করে দেয়। কারণ এসব সংস্থার নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাব বহিরাগত, প্রাকৃতিক নয়। অন্যদিকে, ইসলামী আইন মনোবল ধ্বংস করে না। কারণ এর মধ্যকার নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব প্রাকৃতিক। অতএব, সরকারী এবং শিক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলি শহুরে আয়েশী লোকদের এমনভাবে প্রভাবিত করে ফেলে যে, তাদের আত্মা দুর্বল হয়ে যায়। মনোবল, স্পৃহা, অধ্যবসায় ধ্বংস করে দেয়। কারণ শিশুকাল থেকে নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেও তাদেরকে এসব আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে হয়।

অনেক মাদরাসায় নিয়ম করা হয়েছে, মাথার চুল মুণ্ডাতে হবে। কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যাবে যে, ছাত্রের মধ্যে যাতে বিদ্রোহের মানসিকতা জাগ্রত না হয়। সেটার প্রতিরোধে সতর্কতামূলক এই ব্যবস্থা নেয়া হয়। একটি প্রতিষ্ঠান যখন শিক্ষা বিতরণের পূর্বে এমন শর্ত জুড়ে দেয়, এসব আইন একজন ছাত্রের সকল প্রকারের মনোবল ও স্বকীয়তা স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে দেয়। অন্যদিকে বেদুঈন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের অবস্থা হয় ভিন্নতর। কারণ তারা সরকারি আইন, নির্দেশ ও শিক্ষা ব্যবস্থার আওতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন।

মানুষের রচিত আইন শুধুই মানুষকে শৃংখলিত করে। মানুষের মধ্যকার সুপ্ত ন্যাচারাল কোয়ালিটিকে প্রস্ফুটিত হতে দেয় না। তাকে একজন ভেড়া, নুয়ে পড়া, সিস্টেমের আনুগত দাস বানিয়ে তুলে। কিন্তু যখনই মানুষ মানুষের আইনকে দূরে নিক্ষেপ করে ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার আইনের অধীন হয়ে যায়, তখনই সে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তার মনুষ্য ফিতরাহ জেগে উঠে।

নেতৃত্বের যোগ্যতা। নেতার ছেলেকে নেতা বানানো ভুল সিদ্ধান্ত।

প্রত্যন্ত অঞ্চলের ও মরুভূমির মানুষদের সমাজটা হয় পবিত্র। ভেজালমুক্ত। তাদের মধ্যে যৌথ সামজবদ্ধ মানসিকতা বেঁচে থাকে। এর কারণ হলো প্রত্যন্ত অঞ্চলের কঠিন, সাধারণ জীবন-যাপন পদ্ধতি। কষ্ট সহিষ্ণু ও অনাহারে অভ্যস্ততা। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা তাদের মূল যৌথ মানসিকতা বা মনোভাব হরিয়ে ফেলতে শুরু করে। এই যৌথ মনোভাব ও আচরণের বিষয় নিয়ে ইবনে খালদুন আলোচনা করেছেন তার পুরো বইয়ে। আমরা পর্যায়ক্রমে সেগুলো পরীক্ষা করবো। যেমন একটি সমাজের একজন ব্যক্তি যদি অন্য সমাজের মানুষের সাথে মিলিত হতে থাকে। তাদের সাথে বসবাস করে। তাদের সাথে জোটবদ্ধ হয় বা তাদের মধ্যে মুনিব-কর্মচারী সম্পর্ক তৈরি হয়। আস্তে আস্তে সেই লোক নতুন সমাজে ইন্ট্রিগেট হওয়া শুরু করে। একসময় মানসিকভাবে নতুন সমাজের একজন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এটা হয় তার নতুন পরিচয়। এভাবে ঘনিষ্ঠভাবে অন্য সমাজের সাথে মিলিত হতে থাকায়, সময়ের ব্যবধানে মূল পরিচিতি, দলীয় অনুভূতি, যৌথ মনোভাব হারিয়ে যায়। এরপরেও যারা এই অনুভূতি ধারণ করেন, তাদের মৃত্যুতে অবশিষ্ঠ অনুভূতির স্মরণও হারিয়ে যায় ঐ সমাজ থেকে। এমন অবস্থা প্রাক-ইসলামী যুগ ও ইসলামী যুগের আরব অনারব সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘটেছে।

বর্তমানে নেতৃত্বের সংকট বলে একটি কথা আমরা অহরহ শুনি। এই নেতৃত্বের সংকট কেন হয়? এর কারণ হিসেবে ইবনে খালদুন বলেছেন: ‘‘একই যৌথ অনুভূতি লালন করে না এমন ব্যক্তির উপর নেতৃত্ব দান নেতৃত্বশূন্যতার অন্যতম বড় একটি কারণ।’’ অনেকেই খেয়াল করেন না যে, একটি দল, গোষ্ঠী বা জাতি একজন বা দু’জন নেতা নিয়ে গঠিত হয় না। একটি জাতিকে নেতৃত্ব দিতে তাই যোগ্যতার প্রথম শর্ত হল, সেই ব্যক্তিকে এই জাতির অনুভতি লালনকারী, প্রচারকারী ও হেফাজতকারী হতে হবে। ঠিক তেমনি যে কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও নেতৃত্বের জন্য প্রথমে দেখা উচিত তার মধ্যে কি এই প্রতিষ্ঠানের যে স্পিরিট সেটা কাজ করছে কি না। নতুবা নতুন নেতা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ছেলে খেলা করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। নিজ স্বার্থে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করবেন না। স্পেশালি মতাদর্শিক কোন দলের জন্য একই মতাদর্শে পোড় খাওয়া কোন ব্যক্তিকে নেতৃত্বে না এনে, একাডেমিক যোগ্যতা দেখে নেতা নির্বাচিত করলে পুরো আন্দোলন ভেস্তে যাবে। এবং এটাই আমরা দেখি বর্তমানকালের বিভিন্ন আদর্শিক রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে। ইবনে খালদুন বলেন,

> This is because leadership exists only through superiority, and superiority only through group feeling. Leadership over people, therefor, must, of necessity, derive from a group feeling that is superior to each individual group feeling. Each individual group feeling that becomes aware of the superiority of the group feeling of the leader is ready to obey and follow him.”

অর্থাৎ, নেতৃত্ব কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমেই বেচে থাকে। এবং শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র যৌথ অনুভূতি লালনের মাধ্যমেই বিদ্যমান থাকে। এজন্য জনগণের উপরে নেতৃত্ব অবশ্যই এমন একটি যৌথ অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হওয়া চাই যা প্রত্যেক পৃথক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অনুভূতির চেয়ে উচ্চতর হবে। প্রত্যেক পৃথক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অনুভূতি যখন নেতৃত্বের যৌথ অনুভূতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তাকে অনুসরণ ও তার অনুগত হতে তারা প্রস্তুত হয়ে যায়। নেতৃত্ব যেহেতু দলীয় আদর্শের মাধ্যমে তৈরি হয়, তাই এরজন্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কারও প্রয়োজন পড়ে না।

বরং দলীয় আদর্শে উজ্জীবিত একটি দলের যে কোন সদস্যকে নেতা নির্বাচন করলে তিনিই যোগ্য নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান এই সন্ধিক্ষণে যোগ্য নেতা নয়, বরং আদর্শবাদী, প্রতিশ্রুতিশীল দৃঢ় কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। নেতৃত্ব যদি এমন কারো হাতে তুলে দেয়া হয়, যে এই যৌথ অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা সেটা অর্জনের পথের যৌথ প্রচেষ্টার ব্যাপারে তার কোনই ধারণা না থাকে, তাহলে এমন নেতৃত্ব পতনের পথে পরিচালিত করে। যেমন নেতার ছেলেকে নেতা হিসেবে নির্ধারণ করা। একটি প্রতিষ্ঠান, দল ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সে প্রত্যক্ষ করেনি। সে সহযোদ্ধা ছিল না। অতএব সে সমান মানসিকতা লালন করে না। সে মনে করে সে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এটা তাদের পারিবারিক অর্জন। পূর্বসূরিদের দলীয় অঙ্গীকারের ব্যাপারে সে সচেতন নয়। সে মতাদর্শিকভাবে একজন বহিরাগত।

২০২১ সালের তালেবান-আফগান শান্তি আলোচনার দিকে যদি আমরা নজর দেই, তাহলে দেখবো, দীর্ঘকাল সামরিক সংগ্রামের পরে তালেবানরা রাজনৈতিক সমাধানের পর্যায়ে পৌঁছায়। সে পর্যায়ে নেগোশিয়েশন বা আলোচনার নেতৃত্ব সেইসব নেতাদের দেয়া হয়েছে, যারা এই দীর্ঘ সংগ্রামের পথে প্রাচীরের মতো দাড়িঁয়ে ছিলেন। সন্দেহ নেই, এই আন্দোলনের এই পর্যায় পর্যন্ত তাঁরা আসতে পেরেছেন তাদের আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। প্রতিটি কদমে তারা হাতের মুঠোয় মৃত্যুকে অনুভব করেছেন, পশ্চিমের সামরিক মহা-প্লাবনের সামনে তাঁদের টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁদের মতাদর্শিক ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তার কারণে।

তাদের সংগ্রামের কোন স্তরেই আমরা তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাই না। কিন্তু বর্তমানের এই পর্যায়ে এসে শান্তি আলোচনা ও নেগোশিয়েশন দায়িত্ব যদি মাঠপর্যায়ের সামরিক নেতাদের হাতে না দিয়ে বিদেশে থাকা, উচ্চশিক্ষিত কোনো ব্যক্তিকে দেয়া হতো, তাহলে ফলাফল ঘরে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়তো। এটাই দেখা গেছে সিরিয়ার একসময়ের অন্যতম প্রধান দল আহরার আল-শাম এর ব্যাপারে। বিভিন্ন শান্তি আলোচনার নামে তাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছিল। কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় পর্যন্ত আলোচনার টেবিলে বসেন তারা। কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল ছিল, পুরো দলটাই ভেঙে যাওয়া। এই দলের আর কোন অস্তিত্বই পাওয়া যায় না এখন। এভাবে বর্তমানে পশ্চিমা দেশে

বসবাসরত মুসলিমরা নিজেদের আদর্শ ছেড়ে অন্য আদর্শে ইন্টিগ্রেট হলে কি নেতৃত্বের যোগ্য বিবেচিত হবেন? হবেন না। কারণ তারা একই যৌথ অনুভূতি থেকে আগত নয়। লালনও করেন না।

বেশিরভাগই অভিবাসি। তাদের পক্ষে আরেকজনের যৌথ অনুভূতি লালন করা সম্ভব নয়। অনেকেই সেসব দেশের এক-দু'জন রাজনীতিকের উদাহরণ আনতে পারেন। উত্তরে এটাই বলা যায় যে, এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বিভিন্ন কারণেও এমন কদাচিৎ ঘটনা ঘটে থাকে। এরপরেও এই অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক যারা উচু পর্যায়ে আসীন হয়েছেন তাদের মধ্যে আনুগত্য পাওয়ার বৈষম্যতার অনুভূতি থাকে। কারণ সেখানকার অধিবাসীরা ভিন্ন আদর্শের, জাতের একজনের নেতৃত্ব প্রাকৃতিকভাবেই মেনে নিচ্ছে না।

এখন, যে ব্যক্তি এমন একটি সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, যে সমাজের ঐতিহ্যগত যৌথ অনুভূতি সে ভাগ করে না। নির্দিষ্ট যোগ্যতার কারণে তিনি উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন, মিত্র হয়েছেন। এই পদলাভ কোনোভাবেই তাকে সে সমাজের মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠত্বের গ্যারান্টি দেয় না। সর্বোচ্চ ঘনিষ্ট সম্পর্ক হতে পারে। যেমন মক্কেল বা মিত্রতার সম্পর্ক। যদিও তিনি তাদের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন। তিনি তাদের সাথে মিশে গেছেন। তাদের আত্মীয় হয়েছেন। বলা হচ্ছে তিনি এই সমাজের অংশ। কিন্তু তারপরেও তিনি তাদের নেতা হয়ে যাবেন এটা স্বাভাবিক নয়! কারণ দলীয় যৌথ সমাজিক অনুভূতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী তাদের উচ্চতা বা সুপিরিয়টি প্রমাণ দেয়। সেভাবেই নেতৃত্ব একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যা গ্রুপ অনুভূতির মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। তাই সরাসরি বললে সাদা চামড়ার জনগোষ্ঠীর জন্য শ্যামল বর্ণের লোককে নেতা বানালে সেটা গ্রহনযোগ্য হবে না। কারণ সাদা চামড়ার লোকদের সংগ্রামের কারণেই তারা আজ এই পর্যায়ে এসে পৌছেছে। এখানে অন্য জাতের একজন লোককে নেতৃত্বে বসালে সেটা তাদের জন্য মেনে নেয়া অস্বস্তিকর হবে।

তেমনি মুসলিম দেশে সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিকদের নেতা হিসেবে পছন্দ করলে সেটাও জনগণের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে না। এভাবে আদর্শিকভাবে ভাবলে, সেক্যুলারদের নেতা হিসেবে ইসলামপন্থীরা গ্রহনযোগ্য হবেন না। এটাই প্রাকৃতিক। এটাই বাস্তবতা। নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় প্রথম শর্ত অবশ্যই সেই ব্যক্তি একই গোষ্ঠী থেকে আগত যৌথ অনুভূতি লালনকারী হতে হবে।

নেতৃত্ব, সম্মান ও মর্যাদা মানুষ তার কাজের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। একটি দল, গোষ্ঠী ও সমাজ তাদের কাজের মাধ্যমে এই সম্মান অর্জন করে যায়। যখন কোনো দলীয় অনুভূতি ভীষণ শক্ত ও সমীহ জাগানো হয় এবং সেটাকে বিশুদ্ধ রাখা হয়। তখন সেই দল ও দলের অনুভূতি হয় অনেক কার্যকর। তখন যারাই এই দলীয় অনুভূতি লালনকারী হন, তাদের সম্মান, মর্যাদা শক্তিশালীভাবে বেড়ে যায়। মুসলিম উম্মাহ যতদিন পর্যন্ত তাদের ঈমানী অনুভূতিকে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছিল ততদিন তারা সমীহ জাগানিয়া জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু উম্মাহ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ায় বর্তমান মুসলিম জাতি তাদের সেই নেতৃত্ব পর্যায়ের অবস্থান হারিয়েছে। বিচ্ছিন্ন মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের কারো হয়ত রূপক অর্থে কোন অবস্থান, পদবী থাকতে পারে। কিন্তু এই ধারণা করা যে, তারা কোন শক্তি রাখেন সেটা শুধুই একটা দাবি। বাস্তবতা নয়। মুসলিম জনগোষ্ঠী মূলত উম্মাহ অনুভূতি ধারণের মাধ্যমে গঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু তারা যখন সংগ্রামী জীবন ছেড়ে দেয় ও অন্যান্য জাতির সাথে ইন্ট্রিগ্রেট হতে থাকে, তখন তারা তাদের সেই অনুভূতি ও আদর্শিক শক্তি হারাতে থাকে। এই উম্মাহ অনুভূতি ও ব্যক্তিগত কোয়ালিটির মাধ্যমে মানুষ সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করে। কিন্তু পরবর্তীতে এই লোকেরা যখন আরাম-আয়েশের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন যৌথ অনুভূতি হারিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে আভিজাত্য হারিয়ে যায়।

যেমন উম্মাহর মধ্যে থেকে একটি দলের আবির্ভাব হয় যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরে। কিন্তু প্রথম প্রজন্মের পরে আস্তে আস্তে তাদের মধ্যকার যৌথ অনুভূতি হারিয়ে যেতে থাকে।

> A certain delusion as to their former prestige remains in their souls and leads them to consider themselves members of the most noble houses. They are however, far from that (status) because their group feeling has completely disappeared."

"অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি কাজ করে যে, তাদের পূর্বের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে উঁচু দলের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করে। তবে বাস্তবতা হলো, তারা এই স্ট্যাটাস থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। কেননা তাদের দলীয় অনুভূতি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

এই বিষয়টা আমরা দেখতে পাবো দেওবন্দি ধারার মানুষের মধ্যে। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাকালীন যৌথ অনুভূতি থেকে এর অনুসারী দাবিদারেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। তারা দাবি করেন দেওবন্দি আকাবিরদের অনুসারী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সেটা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন তারা।

এমনিভাবে দেওবন্দের প্রথম জামানার যে অনুভূতি ও কর্মপন্থা ছিল, সংগ্রামের যে স্পৃহা ছিল, সেখান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন এর অনুসারী দাবীকারীরা। ফলস্বরূপ প্রথম যুগের দেওবন্দীদের মধ্যে যে প্রভাব প্রতিপত্তি বিরাজমান ছিল, এ যুগে এসে তা শুধুই কল্পনায় রয়ে গেছে। অনুসারীরা ধারণা করেন, আমাদেরও সেই একই সম্মান মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি। কিন্তু বাস্তবে সেটা বিভ্রান্তি। এটা হওয়ার কারণ, প্রথম জেনারেশনের সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত অবস্থানকে পরবর্তীরা ধরে নিয়েছেন, সেটা এমনি এমনি এসেছে। শুধু এই গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়া মানেই সেই সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করা। তারা আমলে নেননি এই মর্যাদা অর্জনে প্রথম জেনারেশনকে কতটুকু সংগ্রাম ও ত্যাগ করতে হয়েছে। তারা আকাবির ফিলিংসের মধ্যে বুঁদ হয়ে গেছেন।

ইবনে খালদুন বলেছেন, ইসরাইলিদের মধ্যে এমন বিভ্রান্তি খুব দেখা যায়। ইতিহাসের অন্যতম সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী থেকে তারা এসেছে। তাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে ইবরাহীম আঃ ও মূসা আঃ সহ অসংখ্য নবী-রাসূলদের জন্ম হয়েছে। তাছাড়া তাদের মধ্যকার যৌথ অনুভূতি ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যা আল্লাহ তা'য়ালা তার ওয়াদা অনুসারে তিনি তাদেরকে দান করেছিলেন। পরবর্তীতে তারা তাদের সেই যৌথ অনুভূতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিল এবং লাঞ্ছনা ও অপদস্ততার শিকার হয়েছিল।

পৃথিবীতে নির্বাসিত জাতি হিসেবে বাস করার ভাগ্য নির্ধারিত হলো তাদের। হাজার হাজার বছর ধরে তারা কেবল দাসত্ব ও অবিশ্বাস জেনে আসছিল। তবুও আভিজাত্যের বিভ্রান্তি তাদের ছেড়ে যায়নি। তাদের বলতে শুনা যায়: "উনি হারুন আঃ এর বংশের; ইনি ইউশা বিন নূন আঃ এর বংশধর; তিনি এহুদা গোষ্ঠীর লোক।" যদিও অনেক অনেক আগেই তাদের যৌথ অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বহুকাল যাবত তারা অপমানজনক অবস্থায় আছে। এভাবেই শহরের অনেক বাসিন্দা বা বিভিন্ন দলের অনুসারীরা এমন নামকাওয়াস্ত টাইটেল ধারণ করেন। অথচ তারা ঐতিহ্যবাহী যৌথ অনুভূতি ধারণ করেন না। তাই তাদের মধ্যে এমন বাজে রকমের অবস্থা দেখা যায়। আর কোন ক্ষমতাই যাদের নেই তাদেরকে চিহ্নিত করা খুব সহজ। তারা কারো মতামতে প্রভাব ফেলতে পারেন না। কিংবা কেউ তাদের মতামতও নেয় না।

শহরের আয়েশি বাসিন্দারা এই বিভাগে আসেন। বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরাও এই বিভাগে আসেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে ও তাদের জন্য যেসব নিয়ম-নীতি তৈরি করা হয়, তাতে মোটেই ইসলামপন্থীদের সাথে কোন কনসাল্ট করা হয় না।

আরেকটি ব্যাপার খালদুন এখানে বলেছেন যে, ক্লায়েন্ট রাষ্ট্র, যাদের নিজেদের কোন সম্মান ও মর্যাদা নেই, তারা অন্য দেশ ও গোষ্ঠীর সাথে নিজেদের যুক্ত করে সম্মান অর্জন করে। যেখানে লোকদের নিজস্ব কোনো অভিজাত্যের অভিজ্ঞতা নেই। তারা তাদের কর্তাদের আভিজাত্যে অভিজাত হিসেবে পরিগণিত হয়। মতাদর্শিকভাবে ভাবলে দেখা যায়, মুসলিম দেশের গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলারদের নিজস্ব কোন আভিজাত্য, আদর্শ নেই। তারা পাশ্চাত্য থেকে সবকিছু ধার নেয়। পশ্চিমের অনুসরণ করে। এটা স্বাভাবিক। তার চামড়া, জ্ঞান, বংশ তার কোন কাজে আসে না। তার যশ ও মর্যাদা তৈরি হয় নির্দিষ্ট মনিব রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে। যেখানে তার সম্পর্কটা থাকে একজন অনুসারী হিসেবে।

আভিজাত্য অর্জনের বিষয়

খালদুন বলেছেন:

> Nobility originates in the state of being outside. That is, being outside of leadership and being in a base, humble station, devoid of prestige. This means that all nobility and prestige is preceded by the non-existence of nobility and prestige."

আভিজাত্য ও অবস্থান বাইরে থেকে আসে। অর্থাৎ তা আভিজাত্য ও নেতৃত্বের বাইরে থেকে আসে। এর জন্য একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করা হয়। এ সময় প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে না। কাজ হয় নিরহংকার। কাজের মাধ্যমে তা তৈরি হয়। সম্মান, অবস্থান এগুলো প্রথমে শুণ্য থাকে। তারপর তা তৈরি হয়। প্রথম প্রজন্ম জানে এই অবস্থানে পৌঁছাতে তাদেরকে কী মূল্য বহন করতে হয়েছে। তাদের এমন নিরহংকার, একনিষ্ঠ পরিশ্রমে তৈরি ইমেজকে মূল্য দেয় দ্বিতীয় প্রজন্ম। কারণ প্রথম প্রজন্মের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এর পরের প্রজন্ম থেকেই ক্ষয় ও পতন শুরু হয়।

একসময় এমন হয় যে, তারা প্রথম প্রজন্মের সকল গুণাবলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মানুষের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়। কোন একটি দল বা গোষ্ঠীতে যখন এই অবস্থা তৈরি হয়, তখন তারা মনে করে সম্মান, সুনাম, আভিজাত্য এসব আপনাআপনি আসে। যেমন উদাহরণ হিসেবে কওমী ছাত্রদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা অনেকেই মনে করেন, শুধু মাদরাসায় পড়ার কারণে ধর্মীয় অথরিটির সম্মান তাদের প্রাপ্য। অথচ অনেকাংশেই তারা সাধারণ মানুষদের থেকে সম্পর্কহীন। তারা বুঝতে পারেন না এই সম্মান তৈরির পেছনে অনেক কাজ ও সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। আজকে তারা ভুলে গেছেন মানুষের মধ্যে এই ইমেইজ ও অবস্থান কীভাবে তৈরি হয়েছিল। তাদের এই ভাবনা শুধু কওমী মাদরাসার সাথে জড়িত হওয়ার কারণে তাদের সম্মান প্রাপ্য, অন্য কিছুর কারণে নয়। সেটা মানুষের সাথে অন্যান্য সম্পর্কের বিষয়টাকে খাটো করে দেখে। সাধারণ মানুষের সাথে তারা ধর্মীয় আলোচনা থেকে দূরে থাকেন, এই ভেবে যে, তারা এসব আলোচনায় অংশ নেয়ার যোগ্য নয়। নিজেরা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যোগ্য। তাদের ভাবনা ও ইচ্ছা অন্যরা শুধু তাদেরকে অনুসরণ করবেন। এটা যেন নির্ধারিত হয়েই আছে। ধর্মীয় ব্যাপারে বাকিদের তাদের আনুগত্য করতেই হবে। অথচ তাদের অনেকেরই জানা নেই, আনুগত্য পাওয়ার জন্য কোন কোন গুণাবলি অর্জন করা জরুরি।

অবস্থা এমন চলতে থাকলে, একসময় মানুষ ধর্মীয় ইস্যুর সমাধানে অন্যদের কাছে তাদের আনুগত্য দেবে। এটাই লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে। শুধু কওমী মাদরাসা নয়, যে দল, কোম্পানি বা গোষ্ঠী সেটা করে সকলেরই একই অভিজ্ঞতা হয়। মানুষ একসময় তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে। তাদেরকে ঘৃণা করে। আর এভাবেই একসময় যাদের কোন আভিজাত্য, অথরিটি ও ইমেজ ছিল না তাদের সেগুলো তৈরি হয়। এবং তারা পুরনো গোষ্ঠীকে হঠিয়ে সেই অবস্থানে চলে আসে। আর পুরনো গোষ্ঠী একসময় বিলীন হয়ে যায়।

পরাজিতরা অনুসারী হয়, অনুসরনীয় হয় না

পতনোম্মুখ, পরাজিত মানুষকে দেখবেন তারা সর্বদা বিজয়ীকে অনুসরণ করে যায়। পোশাক, পেশা, সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রেই।

> The reason for this is that the soul always sees perfection in the person who is superior to and to whom it is subservient. It considers him perfect, either because it is impressed by the respect it has for him, or because it erroneously assumes that its own subservience to him is not due to the nature of defeat but to the perfection of the victor. If that erroneous assumption fixes itself in the soul, it becomes a firm belief. The soul, then, adopts all the manners of the victor and assimilates itself to him.

অর্থাৎ, এর কারণ হলো মানুষের অন্তর সর্বদা এমন ব্যক্তিদের মধ্যে পরিপূর্ণতা দেখে যিনি তার থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সে তার অধীন ও আজ্ঞাবহ। সে মনে করে সেই ব্যক্তি ত্রুটিহীন, পূর্ণাঙ্গ। এটি তার প্রতি শ্রদ্ধায় প্রভাবিত হওয়ার কারণ হয়। বা এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে সৃষ্টি হয় যে, তার এই আনুগত্য পরাজয়ের কারণে নয়, বরং বিজয়ীর পরিপূর্ণতার কারণে। যদি এই ভুল ধারণাটি অন্তরে গেঁথে যায়, তাহলে একসময় তা বিশ্বাসে পরিণত হয়।

আত্মা তখন বিজয়ীর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করে। এবং নিজেকে তার সাথে সংযুক্ত করে। এইটাই আমরা দেখেছি মুসলিম বিশ্বে। পশ্চিমের কাছে পরাজয়ের পরে আজ মুসলিম বিশ্ব সেই পরাজয়ের কারণে নয়, বরং পশ্চিমাদের নামধারী আধুনিকতাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে মেনে নিয়ে সেটাকেই বিশ্বাসে রুপান্তরিত করেছে, মুসলিম বিশ্বের পরাজিত মানুষেরা। এই পরাজয়কে কখনো বিজয়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না মুসলিমরা তাদের বিশ্বাস ও শারিয়াহর শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসে ফিরে আসবেন।

যাইহোক, পরাজিতরা সর্বদা পোষাক, স্টাইল, উন্নয়ন এবং অস্ত্রের ব্যবহারে বিজয়ীদের সাথে নিজেকে যুক্ত করার জন্য প্রস্তুত থাকে। সবকিছুতে। এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয়, শিশুরা কীভাবে ক্রমাগত তাদের

পিতাদের অনুকরণ করে। কারণ তারা পিতার মধ্যে পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়। এর আলোকে আমাদেরকে এই উক্তির মর্ম বুঝা উচিত।

‘The common people follow the religion of the ruler.’

সাধারণ মানুষ শাসকের ধর্ম অনুসরণ করে। শাসক তার অধীনস্থদের উপর কর্তৃত করে। অধীনস্থরা তাকে অনুকরণ করে। কারণ তারা তার মধ্যে পূর্ণতা দেখতে পায়। ঠিক যেমনটি শিশুরা তাদের পিতামাতাকে বা ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের অনুকরণ করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

কৌশলী বিপ্লব

ইসলামের যৌথ অনুভূতি ছাড়া ইসলামের বাণীর বাস্তব রূপদান সম্ভব নয়। এর কারণ প্রতিটি রাজনৈতিক গণ আন্দোলনের জন্য দলীয় যৌথ অনুভূতির উপস্থিতি জরুরি। বিভিন্ন যুগে আগত রাসূলদের দেখা গেছে তারা তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে সুরক্ষা পেয়েছেন। যেমন হযরত মুহাম্মদ সাঃ আবু তালিবের মাধ্যমে বনী হাশিমের পক্ষ থেকে সুরক্ষা পেয়েছেন। তাছাড়া তিনি মদিনায় হিজরত করার পরে তাঁর মায়ের বংশ বনু নাজ্জারের এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। যদি রাসূলদের এমন অবস্থা হয়, যাদেরকে মুজিযা প্রদান করা হয়েছিল তাহলে অন্যদের বেলায় ব্যাপারটা আরো বেশি কর্যকরী হবে এটাই বাস্তব। একারণে ইবনে খালদুন বলেন, দলীয় যৌথ অনুভূতি ছাড়াই কেউ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের আশ্চর্য কাজ করত সক্ষম হবে এমনটা আশা করা যায় না।

ইবনে খালদুন বলেছেন:

> সাধারণ মানুষ এবং আলেমদের মধ্যে অনেকেই মন্দ নির্মূলে সংস্কারের উদ্যোগ নেন। অনেক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অন্যায়কারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁরা সংস্কারের আহ্বান জানান। মন্দ নিষিদ্ধের ডাক দেন। এজন্য তাঁরা সওয়াবের আশা করেন। তাঁরা জনগণের বিশাল অংশকে তাঁদের অনুসারী এবং সহানুভূতিশীল হিসেবে পান। কিন্তু তাঁরা নিজেদেরকে প্রাণহানির ঝুঁকিতে ফেলেন।

ইবনে খালদুন আরো বলেছেন,

> এমন কাজে তখনই নামা উচিত যখন এই কাজটি সফলভাবে সমাপ্তির ক্ষমতার উপস্থিতি থাকবে।

রাসূল সাঃ বলেছেন:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه وذٰلك أضعف الإيمان

“তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় দেখবে সে যেন তার হাত দিয়ে বাঁধা দেয় আর যদি হাত দিয়ে বাঁধা না দিতে পারে তবে যেন মুখ দিয়ে বাঁধা দেয়, আর যদি মুখ দিয়ে বাঁধা না দিতে পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে বাঁধা দেয়, আর এটি হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯)

বিপ্লবের জন্য তাই জনসমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টাকে অবজ্ঞা করার কারনেই ইসলামী দলগুলো ব্যাপক ক্ষতির শিকার হচ্ছে। জনসমর্থন পেতে বিভিন্ন কৌশল, পন্থা অবলম্বন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে যে পরিবার নিয়ে সমাজ গঠিত হয়, বর্তমান সময়ের আন্দোলের নেতা-কর্মীরা সেই পরিবারের কাছে ব্যর্থ হয়েছেন। আজ এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আলেম, ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা তাদের নিজ পরিবারের কাছে দাওয়াহ পৌঁছে দিতে ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা ঘটেছে বিষয়টাকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে। আর বিপ্লবের অন্যতম প্রয়োজনীয় এই বিষয়টাকে আমলে না নেয়ায় বিপ্লবের কাজে যারা মাঠে নেমেছেন, তারা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। বিপ্লবীদের প্রথমেই পরিবারকে বিপ্লবের সহযোগী করতে না পারলেও নিরপেক্ষ করে দেয়া উচিত। সেটা করতে পারলে বিজয় তড়ান্বিত হবে। নিজ পরিবার থেকে মারমুখী আচরণের মুখোমুখি হতে হবে না।

খালদুন লিখেছেন: শাসকরা শক্তিশালীভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়া ও ধ্বংস করা তখনই সম্ভব হবে যখন পারিবারিক ও সামাজিক শক্তিশালী অনুভূতি নিয়ে কেউ এগিয়ে আসবে।

ইবনে খালদুন বলেছেন: এভাবে নবীগণ তাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, যদিও আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাঁরা দুনিয়ায় থাকা যেকোন কিছুর মাধ্যমে সাহায্য পেতে পারতেন। তবে এটা আল্লাহর হিকমাহ যে, বিষয়টা গতানুগতিক রীতি অনুযায়ীই হবে।

এজন্য আমরা দেখি সমসাময়িক কালের সরকারগুলো ভোটাভুটির মাধ্যমে জনগণের ম্যান্ডেট আদায় করে নেয়। এটা তাদের জন্য শক্তিশালী একটি ব্যাকিং হিসেবে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে ভোটাভুটি নকল হতে পারে। তাহলে কেন তারা নির্বচন দেয়? কারণ, এভাবে তারা সামাজিকভাবে বৈধ ও জনগণের শাসকের তকমা আদায় করে নেয়। সুতরাং যারা বিপ্লব করতে চান, তাদেরকে প্রথমে এই ম্যান্ডেটে আঘাত করতে হবে। জনগণের কাছে সরকারকে একটি অবৈধ, অযোগ্য সরকার প্রমাণ করতে হবে। তখন সমাজ থেকেই একটি শক্তিশালী আহবান আসবে বিপ্লবের জন্য। বিপ্লবের আবহাওয়া তৈরি হবে।

জেনে রাখা উচিত, শুধু সামরিক বিজয় একটি বিপ্লবের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এজন্য চাই রাজনৈতিক বিজয়। আর সেটা সম্ভব জনগণের ম্যান্ডেট বিপ্লবীদের দিকে ধাবিত করার মাধ্যমে।

এখানে এসে খালদুন বলেছেন, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব অনেক বিভ্রান্ত ব্যক্তি নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অথচ তারা জানতেন না যে, এর জন্য তাদের যৌথ অনুভূতির প্রয়োজন পড়বে।

ইরাক ও সিরিয়ায় দাওলাতুল ইসলামিয়ার কথাই ভাবুন। তারা গণসমর্থনের তোয়াক্কা করেনি। ফলশ্রুতিতে তাদের সকল চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

সভ্যতার পরবর্তনকারীদের অবস্থা

ইবনে খালদুন বলেছেন: “একটি রাজত্ব এমন এলাকায় কালেভদ্রে শক্তিশালীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি ও গোষ্ঠী বসবাস করে থাকে। এর কারণ ভিন্ন মত ও চাহিদার পার্থক্য। প্রতিটি মতামত এবং আকাঙ্খার পেছনে একটি গোষ্ঠীর অনুভূতি থাকে। যা সেটাকে সুরক্ষা দিয়ে যায়। এজন্য এমন রাজত্বে বিরোধিতা ও বিদ্রোহ লেগেই থাকে। যদিও সেই রাজত্বের নিজস্ব দলীয় অনুভূতি থাকুক না কেন রাজত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটি গোষ্ঠী মনে করে তারা যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা ও শক্তি ধারণ করে থাকে। মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে জাতিয়তাবাদের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি ধারণ করে মারাত্মক ফিতনায় নিপতিত হয়েছে। বাঙালি, অবাঙালি, পাকিস্তানি, রোহিঙ্গা, আরব, আফ্রিকান ইত্যাদি বিভক্তির দেয়াল উম্মাহকে ধ্বংস করছে। দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। উম্মাহকে পুনরুজ্জীবিত করে খেলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে জাতিয়তাবাদের এই ভয়ংকর জালকে ছিঁড়ে ফেলতে পারলেই কেবল সেটা সম্ভব হবে।

বর্তমানে আমরা দেখি, কওমী, আলিয়া, সালাফী, আহলে-হাদিসসহ অনেক ধর্মীয়ধারা জেলা, থানা ও গ্রামভিত্তিক জাতিয়তাবাদের মহা-উৎসব। এসবই শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রতিবন্ধক। সবাই নিজ দলকে নিয়েই প্লান করছেন, কাজ করছেন। দলের বাইরে পা ফেলতে পারছেন না। এই দলীয় অন্ধত্ব থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নতুবা একটি জাতির উত্থান সম্ভব নয়। যেভাবে ভিন্ন অনুভূতির মাধ্যমে বিভক্ত জাতির পক্ষে ইসলামকে সাহায্য করাও সম্ভব নয়। যেভাবে ভিন্ন অনুভূতিতে বিভক্ত জাতির উত্থান ঘটে না। এমনিভাবে একটি দল বা সংগঠনের মধ্যে যদি একই অনভূতি কাজ না করে, সংহতি না থাকে, তবে সেটা একপর্যায়ে ভেঙে যায়। এবং তাদের মাধ্যমে বড় কিছু কাজ আশা করা যায় না।

৬৩২ খৃস্টাব্দ থেকে আরবরা যখন আরবের গণ্ডি পেরিয়ে রোম-পারস্যে ছড়িয়ে পড়লেন, বিদ্যমান সভ্যতা ভেঙ্গে তখন নতুন সভ্যতার উত্থান ঘটলো। নতুন একটি সভ্যতার উত্থানের সময়কালে তার নির্মাতাদের অবস্থা কেমন ছিল?

ইবনে খালদুন লিখেছেন: তারা (আরবরা) সেই সময় রোম ও পারস্য শাসন করতে এসেছিলেন এবং তাদের পুত্র-কন্যাদের দাস বানিয়েছিল। সেই সময়টিতে আরবদের কোনও আয়েশি সংস্কৃতি ছিল না। এমন কাহিনী রয়েছে যে, যখন তাদেরকে বালিশ দেয়া হয়েছিল তারা সেটাকে মনে করেছিলেন

ছেড়া কাপড়ের বান্ডিল। পারস্য রাজের কোষাগারে পাওয়া কর্পূরকে তারা ময়দায় নূন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। অনুরূপ অনেক কাহিনী রয়েছে। আরবরা তখন পূর্ববর্তী রাজবংশের লোকদের দাস বানালেন এবং তাদরেকে বাড়ির কাজসহ বিভিন্ন পেশার কাজে নিযুক্ত করলেন। এদের মধ্যকার বিভিন্ন(শিল্পে) সূদক্ষ লোককে তারা বেছে নিয়ে তাদের থেকে সেইসব শিল্প শিখে নেন তারা। এবং সেখান থেকে তারা নিজেরাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদরে দক্ষতার বিকাশ ঘটান।

তখনকার আরবরা ভালো তলোয়ার চালাতে জানতেন। ভালো স্লাইপার ছিলেন। তীক্ষ্ণ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিলেন তারা। কিন্তু তারা বিভিন্ন শিল্পে দক্ষ ছিলেন না। বড় ইঞ্জিনিয়ার বা ইকোনমিস্ট ছিলেন না। আসলে সভ্যতা পরিবর্তনের জন্য লাইফ স্কিলে পারদর্শী হওয়া জরুরী নয়। জরুরী নয় বড় ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, প্রোগ্রামার বা ডিজাইনার হওয়া। এসবই আয়েশি ও লাক্সারি জীবনাচারের জন্য। যে নতুনদের হাত ধরে যে নব ব্যবস্থার উত্থান হয়, তারা ক্ষমতায় আসার পরে বিভিন্ন শিল্পে পুরনো দক্ষ লোককে ব্যবহার করেন। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, সংস্থা চালানোর জন্য সেক্ষেত্রে অলরেডি কাজ করা লোককে তারা নিযুক্ত করেন। পরে তারা তাদের কাছ থেকেই শিখে নেন।

ইবনে খালদুন তার ঐতিহাসিক এই বইয়ে যুক্তি দিচ্ছেন যে, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গ্রাম্য লোকেরা উঠে এসে সভ্যতা বদলে দেয়। তারপর তারা বিভিন্ন ক্রাফট, শিল্প শিখে। তাহলে সভ্যতার পরিবর্তনে কোন ধরনের জ্ঞান কাজে লাগে। এব্যাপারে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে উল্লেখ করা সমীচিন মনে করছি। তাঁর জীবনী লেখক থমাস হেগম্যার লিখেন: "ধর্মীয় শিক্ষার উপকারিতার উপর আযযামের অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর নীতির তৃতীয় উপাদান। তিনি এটিকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় হিসেবেই দেখেননি, বরং মুসলমানদের সাফল্য ও কল্যাণের জন্য তাই যথেষ্ট মনে করতেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, মুসলমানদের কারিগরি শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। যদি একজন মুসলমানের বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে তার প্রচেষ্টায় সফল হতে সাহায্য করবেন।"

এখানে আযযাম ইখওয়ানুল মুসলিমিন থেকে উল্লোখযোগ্যভাবে ভিন্ন ছিলেন, যারা কয়েক দশক ধরে তাদের সদস্যদের কারিগরি বিষয়ে অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু আযযাম এটাকে পথভ্রষ্টতা হিসেবেই দেখেছেন:

"(বর্তমান) তারবিয়ার (শিক্ষা) পদ্ধতি ভুল। (ইসলামী দলগুলো) তাদের যুবকদের কাউকে পাঠাচ্ছে মেডিকেল স্কুলে, কাউকে পাঠাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফার্মেসি পড়ার জন্য... (কিন্তু) কে আল্লাহর কিতাব পড়ে দেখবে? আমাদের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কে এর থেকে রায় গ্রহণ করবে? এজন্য আপনি দেখতে পাবেন যে, ইসলামী বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব আলেমদের নিয়ে গঠিত হয়নি। আপনি দেখতে পাবেন যে, ইসলামী দলের নেতা হয়তো ডাক্তার, নয়তো ইঞ্জিনিয়ার অথবা ফার্মাসিস্ট এইসব ব্যক্তিদের শরিয়াহর জ্ঞান খুবই সীমিত। ফলস্বরূপ, আপনি দেখতে পাবেন তারা ক্রমাগত ভুল করছেন।"

থমাস হেগম্যার আযযামের চিন্তার ব্যাখ্যায় বলেছেন: Azzam's preference for religious over technical education manifested itself also in his approach to warfare/ He believed that religious education of soldiers was crucial to military success/so he reserved a large part of the curriculum in the training camps to religious topics.

কারিগরি শিক্ষার উপর ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়ার আযযামের দৃষ্টিভঙ্গি সামরিক ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সৈন্যদের ধর্মীয় শিক্ষা সামরিক সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি প্রশিক্ষণ শিবিরের পাঠ্যক্রমের একটি বড় অংশ ধর্মীয় বিষয়ের জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন।

Azzam's emphasis on religious education was also informed by his sense that Islamic culture was under threat from secularism and other ideologies. The problem with educating only doctors and engineers was that these technical professions exercised no cultural influence on the world:

আব্দুল্লাহ আযযামের ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দেয়ার কারণ ছিল, তাঁর এমন অনুভূতি যে, ইসলামী সংস্কৃতি ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অন্যান্য মতাদর্শ দ্বারা হুমকির মুখে রয়েছে। শুধুমাত্র ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শিক্ষিত করার সমস্যা ছিল যে, এই প্রযুক্তিগত পেশাগুলি বিশ্বে কোন সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রয়োগ করে না। হেগম্যার আযযামের উদ্ধৃতি টেনেছেন: "দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ... এই বিষয়গুলি মানসিকতা পরিবর্তন করে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক কী পরিবর্তন আনবেন? ইহুদিদের দিকে তাকান। আমেরিকা এবং আমেরিকার বাইরের ইহুদিরা ইস্টার্ন স্টাডিজ, ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ভাষা স্টাডিজ, ইতহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি পদগুলিতে বসে আসে... আমাদের ভাইদেরকে শরীয়াহ অধ্যয়ন, সাহিত্য অধ্যয়ন, আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন, ইতিহাস অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেয়া উচিত।"

বদরের যুদ্ধের সময় সাহাবাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল খুবই সীমিত। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়েছিল, শিক্ষাদান। বদর যুদ্ধে বিজয় লাভ করে সাহাবারা মদীনা রাষ্ট্রে ফিরলেন। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে তাদের বড় প্রফেসর, লেকচারার, এনালিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, ডক্টর হতে হয়নি। যুদ্ধে বিজয়ের জন্যও তাদের এমন স্কিলের জরুরত পড়েনি। সমসাময়িক কালে পশ্চিমা সভ্যতার পতনের ঘন্টা বেজেছে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বিপরীতে ইসলামী সভ্যতার পুনঃউত্থান হচ্ছে। রিসেন্ট ডেভোলোপমেন্ট যাচাই করলে দেখা যাবে এর নেতৃত্বে চলে এসেছে তালেবানরা। ইসলামী সভ্যতা বিনির্মানের শক্তিশালী ডাক দিচ্ছেন তারা। কিন্তু তালেবানদের বর্তমান অবস্থা যাচাই করলে দেখা যাবে, তাদের কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি ও ড্রেস-আপ কোনভাবেই ইন্টারন্যাশনাল এলিট শ্রেনীর সাথে যায় না। একবার দেখেই যে কেউ সেটা বলে দিতে পারে। আসলে সভ্যতার উত্থানের পথে মানুষের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। তারপর তারা বিভিন্ন আয়েশি শিল্পে দক্ষ হতে থাকে। এর পারফেক্ট ব্যবহারে প্রতিযোগিতা চলে। যেমন অন্যান্য সভ্যতার মতো আরবদের বেলায়ও তা ঘটেছিল।

ইবনে খালদুন বলেছেন: "এভাবে তারা (আরবরা) এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সীমায় পৌছে যায়। খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বিল্ডিং, অস্ত্র, গালিচা, গৃহস্থালীর সামগ্রী, সংগীত এবং অন্যান্য সকল পণ্য ও আসবাবাদির ক্ষেত্রে বিলাসিতা ও পরিমার্জনের পর্যায়ের আয়েশি সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে তারা। উৎসবের দিন, ভোজ এবং বিবাহের রাতে এমনিভাবে (নিখুঁততা দেখাত) তারা। এই ক্ষেত্রে তারা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এতে আস্তে আস্তে আরবদের কাছ থেকে ক্ষমতা চলে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে অনারবরা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসতে থাকে। যার চূড়ান্ত পতন হয় আরবদের হাত থেকে খেলাফতের দায়িত্ব খসে পড়ার মাধ্যমে। আজকের পশ্চিমা সভ্যতার দিকে নজর দিলে আমরা চূড়ান্ত বিলাসিতা, আয়েশি সংস্কৃতি ও সীমা অতিক্রম দেখতে পাই। করোনা মহামারি এসে পুরো বিশ্বব্যবস্থাকে নাড়িয়ে

দিয়েছে। নেতৃত্বে থাকা পশ্চিমারা সেটাকে ডিল করতে পারেনি সঠিকভাবে।

পশ্চিমের আয়েশি জীবনাচার শারীরিক ও মানসিক বিচারে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এই অস্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইল একটি অসুস্থ জাতি উপহার দিয়ে যাচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে মানবসম্পদ তাদের কাছে বোঝা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অবাধ যৌনাচায় ডুব দিয়ে সকল প্রকারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অলস লাইফস্টাইলের পশ্চিমা সভ্যতায় মানুষ কোন ক্ষেত্রেই স্বনির্ভর নয়। দিন দিন তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে। যে কোন মুহূর্তে পশ্চিমা সভ্যতা হুড়মুড় করে ভেংগে পড়বে, শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। নতুন একটি সভ্যতা দরজায় কড়া নাড়ছে, শুনতে পাচ্ছি। আফগানিস্তানে তালেবানদের উত্থান পশ্চিমা সভ্যতাকে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার মাথা আমেরিকা আফগানে ধাক্কা খেয়ে পরাশক্তির মর্যাদা হারিয়েছে। ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে বৃটেনের প্রভাবশালী দৈনিক 'দ্য গার্ডিয়ান' রিপোর্ট করেছে, বৃটেনের ডিফেন্স সেক্রেটারি বেন ওয়ালেস বলেছেন, "আফগানিস্তানে পরাজয়ের কারণে আমেরিকাকে আর পরাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।"

আফগানিস্তানে পরাজয় হয়তো ফাইনাল পেরেক ছিল। তবে পশ্চিমা সভ্যতার নেতা আমেরিকার পতনের পূর্বাভাষ কিছুকাল ধরে অনেকেই করে যাচ্ছেন। যেমন পুলিতজার জয়ী লেখক, ক্রিস হেজেস বই লিখেছেন, 'আমেরিকা দ্য ফেয়ারওয়েল ট্যুর'। বা বিদায় আমেরিকা। আমরা এই বইয়ের অডিও পর্যালোচনা করেছি। এছাড়া ইমানুয়েল টড বই লিখেছেন, 'আফটার দ্য এম্পায়ার: দ্য ব্রেকডাউন অব দ্য আমেরিকান অর্ডার'। এই বইয়ে তিনি লিখেছেন:

"After years of being perceived as a problem-solver, the US itself has now become a problem for the rest of the world."

"বহু বছর ধরে সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এখন বাকি বিশ্বের জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

যাইহোক, একটি সভ্যতার উত্থানের সময় মানুষ প্রকৃতির খুব কাছাকাছি থাকে। সরল সহজ অকৃত্রিম। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে মানুষ সেই প্রকৃতি হারাতে থাকে। মানবিক গুণাবালি অপরিচিত হতে থাকে। একসময় সে এই দুনিয়ার নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। উত্থান ঘটে আরেকটি সভ্যতার। পৃথিবীর ইতিহাসে আল্লাহর নির্ধারিত এটাই নিয়ম। আরবদের উত্থানের পথে এমনটাই দেখা গেছে। বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার এটাই হাল এখন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা বলেন:

إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليه القول فدمرنٰها تدميرا

আর আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি, ফলে তারা সেখানে অসৎকাজ করে; অতঃপর সেখানকার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। (সূরা ইসরা, আয়াত-১৬)

রাজত্বের সময়কাল

সুপারপাওয়ার আমেরিকার পতনের অনেক ভবিষ্যৎবাণী হলেও কেন আমেরিকার এখনও চূড়ান্ত পতন হয়নি সেটা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। ইবনে খালদুন বলেছেন: "(বড় রাজত্বগুলো দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার) প্রকৃত কারণ হলো ধ্বংস যখন আসে তখন এটি দূরবর্তী অঞ্চলে শুরু হয়। বড় রাজত্বের কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে অনেক প্রদেশ রয়েছে। তাছাড়া, প্রতিটি বিদ্রোহ (ও প্রদেশের পতনের জন্য) নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন। এই অবস্থায় পতনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়ে। কারণ অনেকগুলি প্রদেশ এবং প্রত্যেকটিই তার নিজের সুবিধামত সময়ে পতিত হয়।"

এজন্য বৃহৎ রাজত্বের সময়কাল স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ হয়ে থাকে। আর তাই আমেরিকার মত সুপারপাওয়ার, যার মিলিটারি বেইস পুরো বিশ্বে, তার পতন তো আর একদিনে হবে না। প্রথমে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে একে একে আমেরিকা তার বেইস গুটিয়ে আনবে। এসময় সে তার ভাবমূর্তি হারাবে। তারপর একসময় বিভিন্ন রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। তারা একে একে আলাদা হতে থাকবে। আমেরিকা নামক সুপারপাওয়ার রাষ্ট্রের কথা তখন শুধু ইতিহাসেই লিখা থাকবে। পতনের এই প্রক্রিয়াটা হয় দীর্ঘ।

ইবনে খালদুন আরও বলেন: "একজন ব্যক্তির মতো একটি রাজত্বেরও প্রতিষ্ঠিত থাকার স্বাভাবিক সময়কাল থাকে। একজন মুসলমানের স্বাভাবিক জীবনকাল ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। একশো বিশ বছরের প্রাকৃতিক জীবনকাল কেবল বিরল অবস্থায় ছাড়িয়ে যায়। যেমন হয়েছিল নূহ আঃ এবং আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের মধ্যকার কিছু লোকের সাথে। একটি রাজত্বের জন্যও একই বিষয় প্রযোজ্য হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সময়কাল পৃথক হতে পারে। তবে, সাধারণ নিয়মে কোন রাজত্বই তিনটি প্রজন্মের জীবনকাল অতিক্রম করে না। একটি প্রজন্ম একক ব্যক্তির জীবনের গড় সময়কালের সমান, যথা: চল্লিশ বছর। পরিপক্ক হতে এটা একজনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল।"

জেনে রাখা উচিত, প্রত্যেক ক্ষমতারই একটি সমাপ্তি আছে। একসময় সেটা নিঃশেষ হবে। নতুনের উত্থান হবে। এজন্য যারা শত্রুর ভয়ে দ্বীনকে বিক্রি করে দেন। আনুগত্য বদলে ফেলেন। দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দেন। তারা ভুল পথে হাটেন। ইতিহাস তাদেরকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে। তখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিত হবে।

ইবনে খালদুন চল্লিশ বছরের স্বাভাবিক সময়কাল নিয়ে আরও বলেন, "আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন

দেয় মরুভূমিতে বনী ইসরাইলের (চল্লিশ বছর) কাটানোর তাৎপর্য। এই চল্লিশ বছরের উদ্দেশ্য ছিল একটি প্রজন্মের নিঃশেষিত হয়ে আরেকটি প্রজন্মের উত্থানের ব্যাপারটা। এমন জেনারেশন যারা মিশরে লাঞ্ছনা ও অপমানের সাক্ষী হয়নি। এটি এই ধারণার জন্য প্রমাণ পেশ করে যে, চল্লিশ বছর যা একজন ব্যক্তির জীবনের গড় আয়ু সেটাকে অবশ্যই একটি প্রজন্মের গড় আয়ুকাল হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।”

একটি জেনারেশনের পরিবর্তনের জন্য তাই ৪০ বছরের সময়কালটাকে ধরে নিতে পারেন। তাই জেনারেশন পরিবর্তন করতে হলে কমপক্ষে চল্লিশ বছরের একটি টার্গেট নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। দ্রুত পরিবর্তনের আশা শুধুই ব্যর্থতা ডেকে আনবে।

শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্ঠা না করা, খারেজী চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত

ইবনে খালদুন বলেন: ‘‘কিছু লোক ইমামতের ব্যাপারে অস্বাভাবিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা বলে, ইমামের মোটেও প্রয়োজন নেই, বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বা ধর্মীয় আইন অনুসারে। যারা এই মত পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মুতাজিলা আল-আসাম্ম এবং নিদিষ্ট কিছু খারেজি। তারা মনে করে যে, শুধুমাত্র ধর্মীয় বিধান পালন করাই প্রয়োজনীয়। মুসলমানদের ন্যায়বিচার এবং ঐশী বিধান পালনে কোন ইমামের প্রয়োজন নেই। এবং ইমামতের প্রয়োজন হয় না। যারা এই মত পোষণ করে তাদেরকে ইজমার মাধ্যমে খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের এ ধরনের মতামত গ্রহণ করার কারণ, তারা রাজকীয় কর্তৃত্ব এবং এর দাপট, আধিপত্যবাদী এবং জাগতিক উপায়গুলি থেকে পালানোর চেষ্টা করছিল।তারা দেখেছিল যে, ধর্মীয় আইন এই ধরণের বিষয়গুলির জন্য এবং এর অনুশীলনকারীদের জন্য নিন্দা এবং দোষ দিয়ে পূর্ণ ছিল, এবং তা এই বিষয়গুলো বিলুপ্তির জন্য উৎসাহিত করে।’’ (পৃষ্ঠা ১৫৭)

বর্তমানে আমরা কিছু শায়খদের ও তাদের অনুসারীদের এবন দাবি শোনতে পাই। তারা অনেক ভারসাম্যহীন চিন্তা উপস্থাপন করেন। যেমন, ইসলামী আইন অনুশীলন করতে রাষ্ট্রীয় আইনের কোন সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। বা ইসলাম প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন যেহেতু ইসলাম অলরেডি প্রতিষ্ঠিত, তাই যেকোনো আইনের অধীনেই তার অনুশীলন সম্ভব। কেউ তো আরও আজগুবী তথ্য দেন এভাবে যে, ইসলামী শরিয়া শুধু জাযিরাতুল আরবেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর বাইরে এর কোন ইমপ্লিকেশন থাকবে না। শরীয়া প্রতিষ্ঠার কাজকে তারা খারেজিপনা আখ্যা দেন। তারা বুঝতে পারেন না, অজান্তেই তারা নিজেরাই খারেজি চিন্তাধারা গ্রহণ করে নিয়েছেন। কেউ আছেন যারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে বা এর কাছাকাছি থাকাকে পাপ মনে করেন। পথভ্রষ্টতা মনে করেন। তারা কি ভেবে দেখেছেন, প্রতিটি ইবাদাতের ব্যাপারেই সতর্ক করা হয়েছে। একজন লোকের সালাহ যদি হয় লোক দেখানোর জন্য, কারো দান যদি হয় বিখ্যাত হওয়ার জন্য বা কারো জিহাদ যদি হয় বাহবা পাওয়ার জন্য, তাহলে তার সেই ভাল কাজটি নিন্দনীয়। যেমন নিন্দনীয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। কিন্তু এগুলোই প্রশংসনীয় যদি তা হয় ইখলাসের সাথে, পবিত্র নিয়তে। যেমন প্রশংসনীয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। তাই একপেশে ভাবনায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মত মহান কাজ থেকে বিরত থাকা ও বিরত রাখা একটি নিন্দনীয় বিষয়।

হাদীসে এসেছে রাসূল সাঃ বলেছেন,

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشابٌّ نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه (متفق عليه)

আবু হুরায়রাহ রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন (কিয়ামতের দিন) তাঁর আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক যে যৌবন বয়স আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়েছে, (৩) যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে আবার সেখানে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদেই তার মন পড়ে থাকে, (৪) সেই দুই ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালবাসে। যদি তারা একত্রিত হয় আল্লাহর জন্য হয়, আর যদি পৃথক হয় তা-ও আল্লাহর জন্যই হয়, (৫) সে ব্যক্তি, যে একাকী অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে আর আল্লাহর ভয়ে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে, (৬) সে ব্যক্তি, যাকে কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী যুবতী কু-কাজ করার জন্য আহ্বান জানায়। এর উত্তরে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৭) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে গোপনে দান করে। যার বাম হাতও বলতে পারে না যে, তার ডান হাত কী খরচ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসে প্রথমেই ন্যায়পরায়ণ শাসকের কথা বলা হয়েছে। ইসলামে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের গুরুত্ব অতুলনীয়, তাই রাসূল সাঃ ন্যায়পরায়ণ শাসকের কথা প্রথমেই এনেছেন, যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছাড়া অর্জন সম্ভব নয়।

ইবনে খালদুন বলেছেন: ''আসলে ধর্মীয় আইন সরকারি কর্তৃত্বকে তিরস্কার করে না এবং এর প্রয়োগকেও নিষেধ করে না। এটি নিছক তার দ্বারা সৃষ্ট দুষ্টতা, যেমন অত্যাচার, অন্যায় এবং ভোগবাদের নিন্দা করে। কোন সন্দেহ নেই, এখানে মন্দ কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো সরকারি কর্তৃত্বের সহগামী হয়ে থাকে। ধর্মীয় আইন ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা, ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের এবং ধর্মরক্ষার প্রশংসা করে থাকে। এরজন্য আখেরাতে পুরস্কার রয়েছে। এখন এই সমস্ত জিনিসও রাজকীয় কর্তৃত্বের সহগামী।

সুতরাং, বুঝা যাচ্ছে সরকারি কর্তৃত্বের সাথে যে নিন্দা জড়িত, তা শুধুমাত্র তার কিছু নিদিষ্ট আচরণ ও কিছু নিদিষ্ট অবস্থার কারণে হয়ে থাকে, অন্যান্য কারণে নয়। (ধর্মীয় আইন) সরকারি কর্তৃত্বকে এমনভাবে নিন্দা করে না, অথবা এটি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও করে না। এটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ভোগবাদ এবং ক্রোধের নিন্দা করে। কিন্তু এটি এই গুণগুলির মধ্যকার কোনটিই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্তি চায় না। কারণ প্রয়োজন তাদের অস্তিত্বে থাকার আহ্বান করে থাকে। এটি কেবল দেখতে চায় যে, এর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে। দাউদ ও সুলাইমান আঃ এমন সরকারি কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন যে, এমন কর্তৃত্বের অধিকারী আর কেউ ছিল না। তবুও তারা আল্লাহর নবী ছিলেন এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের অন্যতম ছিলেন।''

ইবনে খালদুন আরও লিখেছেন: "উপরন্তু ইমামত নামক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আইনগত কর্তৃপক্ষকে প্রত্যাখান করার চেষ্টা যারা করেন আমরা তাদেরকে বলি, এমন

ভাবনা আপনাকে মোটেই সাহায্য করে না। আপনি একমত যে, ধর্মীয় আইন পালন একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। এখন এটি কেবলমাত্র গোষ্ঠীগত অনুভূতি এবং ক্ষমতার মাধ্যমে অর্জন করা হয়, এবং গোষ্ঠীগত অনুভূতির জন্য স্বভাবগতভাবেই আইনগত কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন। সুতরাং কোনো ইমাম নিযুক্ত না করা হলেও আইনগত কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব থাকবে। এখন, আপনি যেটাকে প্রত্যাখান করতে চেয়েছিলেন, যদি এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইমামত নামক প্রতিষ্ঠান ইজমা দ্বারা প্রয়োজনীয় বলে প্রতিষ্ঠিত। তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি দলীয় দায়িত্ব হয় যা সমস্ত উপযুক্ত মুসলমানের বিবেচনায় আনা উচিত। তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইমামত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং "প্রত্যেকে আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূল ও তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বশীল লোকদের আনুগত্য করো!"

يٰأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والوى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

এই আয়াত অনুযায়ী ইমামকে মেনে চলবেন।" (পৃষ্ঠা- ১৫৮)

আসলে এই চিন্তাধারার উদ্ভব বর্তমান সময়ে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়ার পশ্চিমা চক্রান্তের জালে অনেকেই জেনে না জেনে আটকে গেছেন। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার মতাদর্শ গ্রহন করেছেন। যা একটি ধর্মকে অকার্যকর করে তুলে। ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা। এখান থেকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আলাদা করা মানে জীবনব্যস্থায় কুঠারাঘাত করা। একে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া।

তলোয়ার ও কলমের গুরুত্বের ভিন্নতা

একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে কী প্রয়োজন। এই সময়ে এই বিতর্কটা খুবই জনপ্রিয়। অধিকাংশকেই দেখা যায়, তারা কলমের অর্থাৎ শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে থাকেন সর্বাধিক। এবং একটি পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত হওয়াকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাধ্যতামূলক মনে করেন। তবে ছোট একটি দল আছেন যারা শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারটাকে খুবই গুরুত্বের সাথে আগে রাখেন।

এব্যাপারে ইবনে খালদুন কী বলেছেন দেখা যাক। আগে কলমের ধার, না তলোয়রের ঝংকার। "এটা জানা উচিত যে, তলোয়ার এবং কলম উভয়টাই প্রয়োজনীয় এবং একজন শাসককে তার কাজে এগুলো সাহায্য করে থাকে। তবে একটি রাজত্বের শুরুতে যতক্ষণ পর্যন্ত তার জনগণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকে, ততক্ষণ কলমের চেয়ে তলোয়ারের প্রয়োজন বেশি। সেই অবস্থায় কলম কেবল শাসকের কর্তৃত্বের একজন দাস এবং এজেন্ট, সেখানে তলোয়ার সক্রিয় সহায়তার মাধ্যমে অবদান রাখে।"

রাষ্ট্র, ইমারাহ ও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম অবস্থায় শিক্ষার চেয়ে শক্তির গুরুত্ব বেশি। কলমের চেয়ে তলোয়ারের জরুরত বেশি। কলমকে অথরিটির বা নেতৃত্বের অনুগামী হিসেবেই কাজ করতে হয়। থাকতে হয়। একজনের কলম অনেক শাণীত হতে পারে। কিন্তু সেটা বিদ্যমান প্রশাসনকেই শুধু সেবা করে যায়। এর বাইরে যাওয়ার সাহস করতে পারে না। কারণ এর বাইরে গিয়ে কলম চালিত হলে তার সুরক্ষার জন্য তলোয়ারের প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে এমন অহরহ উদাহরণ দেখা যায় যে, যার কলম প্রশাসনের অনুগামী নয়, সেটাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চুপ করে দেয়া হয়েছে। আসলে একটি সভ্যতা বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে কলমের খুব কমই প্রয়োজন পরে। বিভিন্ন কারণে কলমের চেয়ে তলোয়ারের এডভান্টেজ বেশি।

ইবনে খালদুন আরও বলেন: "একটি রাজত্বের শেষের দিকেও একই অবস্থা হয় যখন তার গোষ্ঠী অনুভূতি দুর্বল হয়ে পরে। তখন সামরিক বাহিনীর সমর্থনের প্রয়োজন পরে সেই রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এবং নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের মত শক্তিশালী করে রাখা হয়। আর তাই এই দুটি পরিস্থিতিতে তলোয়ার কলমের উপর সুবিধা রাখে। এই সময় সামরিক বাহিনীতে উচ্চ পদস্থরা থাকেন।"

বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে কোন যৌথ অনুভূতির অস্তিত্বই নেই। নেই কোন গোষ্ঠী অনুভূতি। উসমানী খেলাফতের পতনের সময়কাল থেকে জাতীয়তাবাদ ও

গণতন্ত্রের মত নব্য মতাদর্শ গেলানো হয় মুসলিম জনগোষ্ঠীকে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন এই অনুভূতি ফিকে হতে থাকে, তখনই রাষ্ট্রীয় কর্তারা সতর্ক হয়ে উঠেন। যেহেতু স্থানীয় লোকদের অনুভূতি তারা ধারণ করেন না, তাই স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম দেশের শাসকরা বিদেশি শক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করে যায়। বিনিময়ে বিদেশি শক্তি তাদেরকে এমন এক সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যারা তাদেরকে সুরক্ষা দিয়ে যাবে। একারণেই দেখা যায়, মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান শাসকেরা তলোয়ারের শক্তির জোরেই টিকে আছে। পুলিশ ও আর্মির সামান্য অসতর্কতা বিদ্রোহ কিংবা এই শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাদের শাসন উল্টে দিতে পারে।

তাহলে কলমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কখন বেশি থেকে থাকে?

খালদুন লিখেছেন: "রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে শাসক তলোয়ার থেকে কিছুটা দুরত্ব বজায় রাখতে পারে। যেহেতু তার কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তার একমাত্র অবশিষ্ট ইচ্ছা হলো সরকারি কর্তৃত্বের মাধ্যমে অর্জিত লাভ ভোগ করা। যেমন, কর সংগ্রহ, সম্পত্তি ধরে রাখা, অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে উৎকর্ষতায় ছাড়িয়ে যাওয়া। এবং আইন প্রয়োগ করা। এসব ক্ষেত্রে 'কলম' কার্যকরী হয়ে থাকে। অতএব এটি ব্যবহারের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। কোন কিছু না ঘটলে তরবারিগুলো তখন খাপবদ্ধ অবস্থায় অব্যবহৃত থেকে যায়। এই সময়কালে কলমের দক্ষদের কাছে অধিক কর্তৃত্ব থাকে। তারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তারা অধিক সুবিধা ও সম্পদ ভোগ করে থাকেন এবং শাসকের সাথে ঘন ঘন ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।"

একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ থেকে নিয়ে শুরুর প্রথম দিকে ও শেষ পর্যায়ে শক্তির অনুশীলন হয়ে থাকে অত্যন্ত মৌলিক পদক্ষেপ। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠা পাওয়ার এই ইতিহাস লেখার প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজন পড়ে বিশ্বকে জানান দেয়ার যে, এটা কতটুকু মহান। বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক কাজ, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার জন্য জ্ঞানের ব্যাপক ও গভীর অনুশীলনের প্রয়োজন পড়ে। সেই সময় কলমের গুরুত্ব হয় অপরিসীম।

তবে আমাদের এই সময়ে যখন ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, এবং সকল মুসলিম সংগ্রাম করে যাচ্ছেন ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কর্তৃত্বে নিয়ে আসার। এই অবস্থায় কলমের অনুশীলনের অধিক গুরুত্ব প্রদান মোটেই প্রাকৃতিক নয়। জ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নয়ন এখন প্রয়োজন নেই এটা বলা হচ্ছে না। কিন্তু এটাকে তরবারির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া অপচয়। মৌলিক নীতিমালা সালফে সালেহিনের সময়কাল থেকে লিখে দেয়া হয়েছে। সেটাকে প্রয়োজন মতো শুধু উন্নয়ন করা হবে। উন্নয়নের কাজের জন্য জরুরি কাজকে আটকে দেয়া মোটেই গ্রহণযোগ্য ও প্রাকৃতিক নয়। এই অস্বাভাবিক পথে সাফল্য আসবে না। তবে জ্ঞানীদের অনেকেই কেন কলমকে কলমের সময়ে ব্যবহার না করে অসময়ে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন, যা তলোয়ারকে অবমূল্যায়ন করছে? এর এক শব্দে উত্তর হতে পারে কাপুরুষতা।

যে ভিন্ন একটি নিদিষ্ট এজেন্ডার জন্য কাজ করে, সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়

ইবনে খালদুন বলেন: "একজন মানুষ যার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে এবং যার জন্য সে প্রচারণা করে, অবশেষে একদিন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যে মানুষ একটি মতাদর্শের অধীনে চলতে চায় তার জন্য অন্যদের সাথে মিলিত থেকে কোন কাজ করা কঠিন হয়। যেমন ভিন্ন চিন্তাধারার লোক নিয়ে কোন সংগঠন করা হলে দ্রুত কোন্দল তৈরি হয়, এবং একসময় তা ভেঙ্গে যায়। মুসলিম দেশগুলোর আজকের রাষ্ট্র ব্যবস্থা একই চিন্তাধারার লোক নিয়ে গঠিত না হওয়ায়, তার ভিত্তি খুবই দূর্বল। সবসময় তা বিদেশি শক্তির মদদপুষ্ট হয়ে থাকে। মতাদর্শিক ভিন্নতা থাকায় বিদেশি শক্তি সহজেই একটি দেশের প্রশাসনে অনুপ্রবেশ করতে পারে।"

মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমা কারিকুলামে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছে। এদিকে স্থানীয় জনগণের সংস্কৃতি পশ্চিমের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জনগণ বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থাও চালু করেছে। এভাবে একটি দেশের জনগণ জীবনের শুরু থেকেই একটি পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা ও মতাদর্শ নিয়ে বড় হচ্ছে। শুধু কি রাষ্ট্রের এই অবস্থা? পুরো সমাজটাই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ও সাংঘর্ষিকভাবে গড়ে উঠেছে। এমনিভাবে ভিন্ন চিন্তাধারার প্রচারকরা একসাথে কোন সংগঠন গঠন করলে সেটা বেশিদিন টিকবে না। টিকবে না কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করলেও। সুতরাং সফলতার জন্য প্রথমে মতাদর্শে ঐক্যমত জরুরি।

মনস্তাত্ত্বিক কারণ, যুদ্ধ জয়ের মূল উপাদান

ইবনে খালদুন বলেছেন: "মনস্তাত্ত্বিক ও অনুমিত বিভিন্ন কারণের ফলাফল হিসেবে যুদ্ধে বিজয় আসে। সংখ্যা, অস্ত্র এবং সঠিক কৌশল হয়তো বিজয়ের গ্যারান্টি দিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত জিনিস উল্লিখিত কারণগুলোর (মনস্তাত্ত্বিক কারণ) চেয়ে কম কার্যকর।"

অর্থাৎ রাজনৈতিক বিজয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য যে কোন বিদ্রোহী দলকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শাখা রাখতে হয়। যারা প্রতিনিয়ত বিদ্রোহকে রাজনৈতিকভাবে গাইড করে যাবেন। মনে রাখতে হবে, বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থা সবসময় বিদ্রোহীদের চেয়ে অনেক বেশি সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রধান্যতার মাধ্যমেই বিজয় অর্জিত হতে পারে। শত্রু মানসিকভাবে পরাজিত হলে, সামরিক পরাজয় সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মানসিকভাবে পরাজিত না হলে দীর্ঘদিন তারা টিকে থাকতে পারে। এর সদ্য একটি উদাহরণ আফগানিস্তানে তালেবানদের বিজয়। রাজধানী কাবুলে প্রবেশের পূর্বেই সাবেক সরকারের সামরিক ও বেসামরিক সকল সেক্টরে মনস্তাত্ত্বিক ধস নামে।৩০০ হাজারের উপরের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি সুসজ্জিত ফোর্স কোন প্রতিরোধই দেখাতে পারে নি। অথচ তারা চাইলে আরও অনেক দিন টিকে থাকতে পারত।

অনেক সময় একটি রাষ্ট্রের প্রতি থাকা ভীতি ও শ্রদ্ধা তার পরাজয়কে দীর্ঘায়িত করে। যেমন আমেরিকার মত সুপার পাওয়ারের পরাজয় এ কারণেই অনেকে বুঝতে পারছেন না। বা সেটা দীর্ঘায়িত হচ্ছে কারণ তার প্রতি সাধারণ মানুষ ও বিদ্রোহীদের ভীতি রয়ে গেছে এখনও। সুতরাং বিদ্রোহীদেরকে আমেরিকাকে এখন রাজনৈতিক মাঠে পরাজিত করতে হবে। আরেকটি উদাহরণ হতে পারে, সোভিয়েত ইউনিয়নের। তার নিয়ন্ত্রণে থাকা কয়েকটি রাষ্ট্র সোভিয়েত থেকে আলাদা হতে চাইলেও সেই সাহস তারা করতে পারেনি। কিন্তু আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের পর, সেই রাষ্ট্রগুলো আলাদা হয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

বাংলাদেশের ইসলামপন্থী রাজনীতির অবস্থা পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় এই মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় ও বিদেশি মদদপুষ্ট সেক্যুলার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও লেখালেখি করে বিজয় লাভ সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে শক্তির ব্যবহারই কার্যকরী হবে। সাথে থাকবে প্রভাব বিস্তারকারী রাজনৈতিক পলিসি। একটা পর্যায় আসবে যখন শক্তি নয়, প্রয়োজন পড়বে কলমের। বক্তৃতার।

ইবনে খালদুন বলেছেন, "স্বীকৃত রীতি-নীতি ক্ষমতাশীন সরকারের প্রতি আনুগত্যকে অপরিহার্য

ও বার্ধতামূলক করে। এটি নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অনেক বাধা সৃষ্টি করে থাকে। তার অনুসারী এবং সমর্থকদের নিরুৎসাহিত করে। নিজ কর্মীরা হয়তো তার আনুগত্য এবং তাকে সাহায্য করার জন্য পুরোপুরি অভিপ্রায় পোষণ করে, কিন্তু আরও অনেক দুর্বল ও অলস লোকেরা আছে যারা ক্ষমতাসীন প্রশাসনের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এই ভেবে যে, এটা ক্ষমতাসীনদের পাওনা।"

অর্থাৎ যথাযথ কারণ থাকার পরেও অলসতা, প্রচলিত ন্যারেটিভ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত প্রথার কারণে মানুষ বিপ্লবের সহযোগী হতে চায় না। অনেক মানুষ অতীতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা করেন না। তারা ভাবেন সমাজে প্রচলিত সরকারি নিয়ম-কানুন আদিকাল থেকে চলে আসছে, বা অনন্তকাল চলতে থাকবে। তাদের এই ভাবনার কারণে তারা সুবিচার চাইলেও সংস্কার চান না। তাছাড়া সংস্কারের পথে গিয়ে তারা ক্যারিয়ার ধ্বংস করতে চান না। বেশিরভাগ মানুষ জীবনটাকে দুনিয়ার আরাম আয়েশের জন্য কুরবান করে দেয়।

তারা চান না তাদের এই লাইফস্টাইল বাধাগ্রস্ত হোক। এটা তাদের মধ্যে দুর্বলতা তৈরি করে। তারা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তাদের মধ্যকার কিছু একটা করার মানবিক ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে যায়। তাছাড়া অলসতার কারণেও মানুষ বিদ্যমান সরকারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে চায় না। বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মানুষের মনে এই বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে যে, সরকার, রাষ্ট্র, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের প্রশ্নাতীত আনুগত্য আবশ্যকীয়। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির অনুগত থাকা নৈতিক দায়িত্ব।

খালদুন লিখেছেন: "অতএব, খুব কম ক্ষেত্রেই একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সক্ষম হন। ফলস্বরূপ তিনি ধৈর্য্য অধ্যবসায় নিয়ে বসে থাকেন, যতক্ষণ না ক্ষমতাসীন সরকারের মধ্যকার ক্ষয় ও দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একসময় জনগণ এই বিশ্বাস থেকে ফিরে আসে যে, ক্ষমতাসীন প্রশাসনের পাওনা হল, জনগণ তাদের বশ্যতা স্বীকার করে যাবে।"

এজন্য নতুন বিপ্লবীদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। যারা ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাদেরকেও ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। বিদ্যমান সরকারের আনুগত্যে মানুষ একসময় বিরক্ত হয়ে উঠবে। তখন তারা নতুন প্রশাসনের জন্য মুখিয়ে থাকবে। বিদ্রোহ করতে হবে তখনই।

তাছাড়া ইবনে খালদুন বলেছেন: "বিদ্যমান শাসকেরা অনেক বিলাসী জীবন উপভোগ করে। এর সদস্যদের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্যদের তুলনায় নিজেদের জন্য তারা রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বরাদ্ধ করে রাখে। সুতরাং তাদের আস্তাবলে অনেক ঘোড়া এবং ভাল অস্ত্র বিদ্যমান থাকে। তাদের মধ্যে থাকে অনেক রাজকীয় আড়ম্বরতা। এই সমস্ত কিছু দিয়েই তারা তাদের শত্রুদের ভয় দেখায়।

"অথচ নতুন রাষ্ট্রের সদস্যদের এই ধরনের জিনিসের অভাব থাকে। তাদের মধ্যে গ্রাম্য মনোভাব বিদ্যমান থাকে ও তারা দরিদ্র হয়ে থাকেন। এমন অবস্থা তাদেরকে অপ্রস্তুত করে রাখে। ক্ষমতাসীন প্রশাসনের উন্নত ব্যবস্থাপনার কথা শুনে তারা উদ্বিগ্ন থাকেন। এ কারণে তাদের নেতা ক্ষমতাসীন প্রশাসনে জড়াজীর্ণতা ছেড়ে না যাওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য হন। যতক্ষণ না তার মধ্যকার যৌথ অনুভূতি এবং রাজস্ব কাঠামো ভেঙে যায়। এমতাবস্থায় নতুন শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সুযোগ কাজে লাগান। আক্রমণ শুরুর অনেক পরে এসে তার প্রধান্যতা বিস্তার লাভ করে।"

আমাদের এই সময়কালে আমরা এর খুব প্রচলন দেখতে পাচ্ছি। বিদ্যমান সরকারের সমর্থকরা শাসকের নিকটতম হওয়ার সুযোগ নিয়ে টেন্ডার, চাঁদাবাজিসহ হেন কোন কাজ নেই, যা তারা করে

না। যেহেতু যৌথ অনুভূতির বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই আধুনিককালে ভিন্ন ভিন্ন দলের অস্তিত্ব থাকলেও একই মতাদর্শের হওয়ায় সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে না। বিপ্লবের জন্য সময়ক্ষেপন হচ্ছে। ঘুরে ফিরে একই ক্যাটাগরির কিছু এলিট ক্লাসের লোক ক্ষমতায় আসছে।

মানবসভ্যতার সংঘবদ্ধ পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব জরুরি

ইবনে খালদুন বলেন: "মানবসভ্যতার সংঘবদ্ধ (পরিচালনার) জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব জরুরি। আমরা এর আগে একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছি যে, মানুষের সামাজিক সংঘবদ্ধতা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এটি সেই জিনিস যা 'সভ্যতা' দ্বারা বোঝানো হয় যা আমরা আলোচনা করে আসছি। মানুষের যে কোনো সামাজিক সংঘবদ্ধতায় এমন কাউকে থাকতে হবে যিনি একটি সংযত প্রভাব প্রয়োগ করেন, তাদেরকে শাসন করেন এবং যিনি তাদের আশ্রয় হতে পারেন। তাদের ওপর তাঁর শাসন কখনো কখনো ওহির মাধ্যমে অবতীর্ণ ধর্মীয় আইনের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে।"

অর্থাৎ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব খালদুনের মতে আবশ্যকীয় ও মানবসভ্যতার জন্য একটি প্রাকৃতিক বিষয়। একজন মানুষ যেকোনো মতাদর্শের, ধর্মের, দেশের হোক তার জন্য স্বাভাবিক যে, সে রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহন করবে। তবে কিছু মানুষকে পাওয়া যায়, যারা অরাজনৈতিক মতাদর্শের প্রবক্তা। মুসলিমদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। যারা বলেন, মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থান জরুরি নয়। তাদের এসব কথা আসলে মানবতা ও সভ্যতা বিরোধী। তারা নিজেদের অজান্তেই মানবসভ্যতার প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছেন। আর যারা জেনে বুঝে এমন মতাদর্শ প্রচার করেন, তারা কোন এক অশুভ শক্তির সহায়ক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। কিংবা নিজেদের অলসতার জন্য একটি অজুহাত খুঁজে নিয়েছেন।

শহরের অলস বাসিন্দারা সভ্যতাকে কলুষিত করে

ইবনে খালদুন লিখেছেন, "(শহরের আয়েশি বাসিন্দারা) তারা সাধারণত ব্যবসা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে শহরটিকে কলুষিত করে। ব্যক্তি পর্যায়ে অধিবাসীদের দুর্নীতি তাদের (বিলাসবহুল) রীতিনীতি বাস্তবায়নের চাহিদার কারণে সৃষ্টি হয়। (ফলস্বরূপ) এসবের চাহিদা পূরণের চেষ্টারত অবস্থায় তারা খারাপ আচরণ অর্জন করে। এসব (খারাপ আচরণ) অর্জনের কারণে আত্মা জরাগ্রস্ত হয়ে যায়। উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত পদ্ধতিতে হোক, জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের মধ্যে অনৈতিকতা, অন্যায়, অসততা এবং ছলনা বৃদ্ধি পায়। আত্মা যখন জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে ভাবে, এটি নিয়ে অধ্যয়ন করে। তখন সে এরজন্য সম্ভাব্য সকল কূটকৌশল ব্যবহার করতে চায়। মানুষ তখন মিথ্যা, জুয়া, প্রতারণা, জালিয়াতি, চুরি, মিথ্যাচার এবং সুদে লিপ্ত হয় নিষ্ঠার সাথে।"

হুবহু এসব আমরা বর্তমান সমাজে দেখে থাকি। নিজেদের চাহিদার যোগান দেয়ার জন্য এমন হেন কোন খারাপ কাজ নেই যা মানুষ করছে না। শুধু কি তাই? অনৈতিক কাজে দক্ষের উপরে সুদক্ষরা আসছেন।

খালদুন বলছেন, "কারণ বিলাসিতা থেকে সৃষ্ট অনেক প্রবৃত্তি ও আনন্দের কারণে তারা অনৈতিকতার সকল উপায় ও পন্থা সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারে। তারা এ ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলে।"

আসলেই। বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে, নৈতিকতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। বরং নৈতিকতাকেই খারাপ চোখে দেখা হয়। অনৈতিকতাকে শিল্প হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তারা অনৈতিকতা নিয়ে যখন আলোচনা করে। খালদুন বলছেন, " তারা এটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সমস্ত ধরাবাঁধা নিয়ম বর্জন করে। এমনকি আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ মহিলা সম্পর্কের মধ্যেও নিয়ম-কানুন ত্যাগ করে, যেখানে বেদুঈন মনোভাবের জন্য শালীনতা বজায় রাখা এবং অশ্লীলতা বর্জন করা প্রয়োজন।"

তাছাড়া খালদুন বলছেন, "তারা জালিয়াতি এবং প্রতারণা সম্পর্কেও আগাগোড়া সবকিছু জানে। যা তারা তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে এবং তাদের মন্দ কাজের জন্য প্রত্যাশিত শাস্তির বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করে। অবশেষে, এটি তাদের বেশিরভাগেরই চরিত্রের একটি রীতি এবং বৈশিষ্ট হয়ে ওঠে, কেবল আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে রক্ষা করেন তারা ব্যতীত।"

অর্থাৎ সিস্টেমকে ফাঁকি দেয়ার কৌশল রপ্ত করে নেয় তারা। যে যত বেশি শিক্ষিত ও স্মার্ট সে ততো

সিস্টেমকে ফাঁকি দিতে পারে। বর্তমান সময়ে এর একটি উদাহরণ হতে পারে প্যান্ডোরা পেপারস। দুর্নীতিবাজদের দুর্নীতি তদন্ত করেছিল সাংবাদিকদের বেসরকারি সংস্থা। তদন্তের নাম ছিল প্যান্ডোরা পেপারস। বৃটিশ পত্রিকা ইন্ডিপেনডেন্টের দৃষ্টিতে 'প্যান্ডোরা পেপারস' হচ্ছে বৃহত্তম বৈশ্বিক আর্থিক তদন্তগুলির মধ্যে একটি। ১১৭ দেশের ১৪০টি মিডিয়া সংস্থার ৬০০ জনেরেও বেশি সাংবাদিক একত্রিত হয়ে এই কাজ করেছেন।

তারা বিশ্বের ধনী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিদের সম্পদ গোপন ও কর ফাঁকি দেয়ার কৌশলগুলি পরীক্ষা করে দেখেন। আইনি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় প্রভাবশালীরা তাদের সম্পদ গোপনে বিদেশে লুকিয়ে রাখেন। প্যান্ডোরা পেপারে বড় বড় কোম্পানির নামও এসেছে।

অথচ আমরা দেখতে পাই ইসলামী আইন কতো ব্যাপক ও জনহিতকর। একজন সিস্টেমকে ফাঁকি দিতে পারলেও আল্লাহ তায়ালাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তাই দেখা যায় কুরআনে আইন বর্ণনার সময় দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে হাঙ্গামা বাঁধাতে তৎপর হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে...................। এটা হলো তাদের জন্য দুনিয়ার লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (মায়েদা, ৩৩)

এজন্য সমাজে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হলে স্মার্টরা সাধারণের অধিকার কেড়ে নেবে না।

খালদুন বলেছেন, তখন শহরটি নিন্দনীয় চরিত্রের লোকে ছেয়ে যায়। এ সমাজে তখন আর জ্ঞানীর কদর থাকে না। এমনটাই আমরা দেখতে পাই এখন আমাদের সমাজে। নিন্দনীয় চরিত্রের জয়জয়কার। সমাজের সর্বস্তরে তারা ছেয়ে গেছে।

যার চরিত্র দূষিত, ভাল বংশ পরিচয় তার কোন কাজে আসে না

ইবনে খালদুন আরও বলছেন, "যার চরিত্র দূষিত, ভাল বংশ পরিচয় তার কোন কাজে আসে না। সুতরাং লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মহান পরিবারের অনেক বংশধর, অত্যন্ত সম্মানিত বংশোদ্ভূত, রাজবংশের সদস্যরা জীবিকা নির্বাহের জন্য নিম্নমানের পেশা গ্রহণ করে। কারণ তাদের চরিত্র দুনীর্তিগ্রস্ত এবং তারা অন্যায় ও অবৈধ কাজে লিপ্ত। যদি এই পরিস্থিতি কোনো শহর বা জাতিতে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তায়ালা সেটিকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন।"

অর্থাৎ, যাদের স্বভাবে দুনীর্তি বাসা বেঁধেছে, তারা নিম্নমানের মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ভালো পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড তখন তাদের কোন কাজে আসে না। একসময় উচ্চ পর্যায়ের জব করতে থাকা বা সম্মানজনক কাজ করা এই লোকেরা নিম্নমানের অসম্মানজনক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এখানে নিম্নমানের কাজ বলতে ইবনে খালদুন হয়তো বুঝিয়েছেন, অসম্মানজনক কাজ। যা কোন সময় বৈধ নাও হতে পারে। যখন এমন অবস্থা হয় যে, যারা সম্মানজনক ও তাদের যোগ্য পেশায় যোগ দেয়ার কথা, তারা সেটা ছেড়ে অসম্মানজনক, নিম্নমানের পেশায় যোগ দেয় তখন শহরে পতন অবধারিত হয়ে যায়।

বর্তমানে আলেমরা তাদের যোগ্য কাজ ছেড়ে (আমর বিল মা'রুফ) বিভিন্ন পেশাকে মূল জব বানিয়ে নেয়ায়, তা পতনের জন্য যথেষ্ট। তাদের স্থানে এমন লোক সেসব পেশার দায়িত্বে আসছে যারা সম্পূর্ণ অযোগ্য ও দ্বীনের ধ্বংস ডেকে আনছে। একটি ব্যবসা ও অন্যান্য কাজ জেনারেল জ্ঞানের অধিকারী যে কেউ করতে পারে। কিন্তু একটি মসজিদের যোগ্য ইমাম হওয়া, একজন মাদরাসার শিক্ষক হওয়া, আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের সঠিক কাজ আঞ্জাম দেয়া পূর্ণরূপে সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে প্রকৃত আলেমের বিশাল সংকট রয়েছে। প্রতিটি দল, প্রতিটি অর্গানাইজেশন এটা অনুভব করে থাকে।

উনিশ শতকের প্রখ্যাত মুজাহিদ আলেম শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন আলেমদের তৈরি, আশ্রয় ও কাজে যুক্ত করার জন্য।

তিনি বলেন: "দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি এগুলো হলো এমন সাবজেক্ট যা মানসিকতায় পরিবর্তন আনে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক তিনি কী পরিবর্তন আনবেন? ... ইহুদিদের দিকে তাকান। আমেরিকা এবং আমেরিকার বাইরে ইহুদিরা ইস্টার্ন স্টাডিজ,

আরবি ভাষা অধ্যয়ন, ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি পদে বসে আছে। আর আমরা আমাদের জন্য শুধু চাই মুসলিম ডাক্তার, মুসলিম উকিল, মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার। আসলে আমাদের উচিত আমাদের ভাইদের শরিয়াহ, সাহিত্য ও আরবি ভাষা অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেয়া।"

এজন্য খালদুন লিখেছেন, এটাই আল্লাহর বাণীর অর্থ "যখন আমরা কোনো জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন আমরা এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা বিলাসিতা করে তাদের সেখানে খারাপ কাজ করার আদেশ দেই। সুতরাং আদেশ সত্য হয়ে যায় এবং আমরা এটি ধ্বংস করি।

وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيۡهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَٰهَا تَدۡمِيرٗا

(সূরা আল- ইসরা, আয়াত-১৬)

দেখুন মুসলিম দেশগুলোর নেতৃস্থানীয়দের অবস্থা। আলেম হোক, নেতা হোক বা ব্যবসায়ী হোক না কেন, সবাই একই অবস্থায়। তাইতো অপমানজনক ও ধ্বংসাত্মক জীবনযাপনের মধ্যে মুসলিমদের অবস্থান। বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখা যায়, কীভাবে এই জনপদের অধিবাসীরা ফিসক্বি কাজে জড়িয়ে পড়েছে। চতুর্দিকে দুর্নীতি ও অসততা ছেয়ে গেছে। এমন অবস্থা দাঁড়ালে কী হতে পারে।

খালদুন বলছেন: "যখন একজন মানুষের শক্তি এবং তারপর তার চরিত্র ও ধর্ম কলুষিত হয়, তখন তার মানবতা কলুষিত হয় এবং সে বাস্তবে একটি পশুতে পরিণত হয়।"

বর্তমানে আমরা কি এমন ফলাফলই দেখতে পাই না? মানুষের মানবতা কোথায়? মানবতার এমন ফেরিওয়ালা বের হয়েছে, যারা সবচেয়ে বেশি মানবতা বিরোধী কাজ করছে। আজকে আমাদের প্র্যাকটিসিং মুসলিমদের ইমানের শক্তি কোথায়? শক্তিশালী ধর্মীয় অনুপ্রেরণা কোথায়? মানবিক আচরণ ও গুণাবলি কোথায়?

সবকিছুতে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। আজকাল মানুষের মধ্যে তার ধর্ম এমনভাবে কলুষিত হয়েছে, দেখা যায় অশ্লীল সিনেমাসহ অনেক অনৈসলামিক কাজের উদ্বোধন হয় ইসলামের সংবিধান কুরআনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে। আবার পরকালের যাত্রীকে স্মরণ করা হয় আরেক অনৈসলামিক কাজ গান-বাজনা দিয়ে। এভাবে জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ অনুষ্ঠান, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত সকল প্রকারের আচার অনুষ্ঠানে আজকে আমরা চারিত্রিক ও ধর্মীয় কলুষতা দেখতে পাই। এভাবে দুর্নীতি যখন বাসা বাঁধে তখন ক্ষয় আবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

আত্মা শ্রেষ্ঠত্য ও আধিপত্য খুঁজে বেড়ায়

খালদুন লিখেছেন, "খুব স্বাভাবিক ভাবেই আত্মা শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্য খুঁজে থাকে। একটি শক্তিশালী সরকারের (উপস্থিতিতে) আবহাওয়া হয় সম্পূর্ণ মুক্ত-স্বাধীন। নেতৃস্থানীয়রা তখন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়ার প্রতিযোগিতায় নামে। সবাই এক অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় নামে। অনুসারী বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকেন তারা। যা আছে সব ব্যয় করতে থাকে। প্রত্যেকে তার সহকর্মীদের নিয়ে একটি দল গঠন করে। এবং সর্বশেষ তাদের মধ্যকার একটি দল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।"

এমন বিশৃংখল সমাজেই আজ আমাদের বসবাস। সমাজকে একক কোন উচ্চতর শক্তি নেতৃত্ব দিচ্ছে না। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ দূর্বল ও বিদেশি মদদপুষ্ট কিছু সুবিধাভোগীদের হাতে। এমতাবস্থায় আজ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গজিয়ে উঠা দলগুলো নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে উঠেপড়ে লেগেছে। আমরা দেখছি রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিতে ছোট বড় বিভিন্ন দলের আবির্ভাব হয়েছে। এমনকি, মুজাহিদদের পর্যন্ত বিভিন্ন দল দেখা যায়। এটা স্বাভাবিক। কারণ, এখন এককভাবে কেউ নেতৃত্ব দিচ্ছে না। উম্মাহর মধ্যে, মুসলিম বিশ্বসহ পুরো বিশ্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল শূণ্যতা বিরাজ করছে। এই অবস্থায়, যারা যোগ্য, ধৈর্য্যশীল, সত্য পথের যাত্রী তারাই বিজয় ছিনিয়ে নেবে।

একজনের অর্জনে অন্যজন বঞ্চিত হয়

ইবনে খালদুন বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষই কিছু পাওয়ার চেষ্টা করে, এব্যাপারে সকল মানুষ সমান। সুতরাং, একজন যা কিছু অর্জন করে অন্যজন সেটা থেকে বঞ্চিত হয়, যদি না সে এর বিনিময় হিসেবে কিছু প্রদান করে।"

খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা। সবাই সবকিছু অর্জন করতে চায়। কিন্তু একজন যখন একটা জিনিস অর্জন করে, আরেকজন একই জিনিসে বঞ্চিত হবেন স্বাভাবিকভাবেই। বিশেষ করে ক্ষমতার বিষয়টা। একজন ক্ষমতায় গেলে, আরেকজন এ থেকে বঞ্চিত হন। পদ-পদবীর বিষয়গুলোও একই। সবাই পদের আকাঙ্ক্ষী হলেও, সকলেই তো আর পদ নিতে পারেন না। শুধু কাউকে পদচ্যুত করার মাধ্যমেই আরেকজনের পক্ষে সম্ভব সেই পদ গ্রহন করা। অর্থাৎ একজনের আসন গ্রহণে আরেকজন বঞ্চিত হন।

মানুষ পূর্বপুরুষদের নয়, রীতিনীতির গোলাম

ইবনে খালদুন বলেছেন, "প্রথা মানুষের স্বভাবকে সেই জিনিসগুলোর দিকে ঝুঁকে থাকতে বাধ্য করে যা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মানুষ তার পূর্বপুরুষদের অনুগামী নয় বরং রীতিনীতির গোলাম।"

মানুষ আসলে রীতিনীতির গোলাম। কোনোভাবেই যেন তার জন্য সেটা ছাড়া সম্ভব হয় না। পূর্বপুরুষদের সঠিক পথে থাকতে পারে না মানুষ। পদস্খলন ঘটে। নতুন নতুন অভ্যাসের কারণে যে রীতিনীতি উপকারী সেটা থেকে বেরিয়ে এসে এমন এক প্রথার সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে যা তার পূর্বপুরুষের নীতি বলে দাবি করলেও সেটা সত্য নয়। নবী-রসূল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মানবসমাজে সংস্কার আসে, এবং মানুষ তার সৃষ্টিগত প্রকৃতিতে ফিরে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা নতুন নতুন অভ্যাস গড়ে তুলে প্রকৃত মনুষ্য স্বভাব থেকে অনেক দূরে সরে যায়। এবং একসময় সেগুলোই তাদের সংস্কৃতি, প্রথা ও অভ্যাসে পরিণত হয়। এর গোলাম হয়ে যায় তারা। এর অনুগামী হিসেবে বসবাস করতে থাকে। আর মানুষের প্রকৃত ফিতরাহ বা স্বভাবে সে অপরিচিত হয়ে পশুর স্বভাবকে ধারণ করতে থাকে। এভাবে যে রীতিনীতি তৈরি হয়, তার স্বভাব তাকে সেই রীতিনীতি বা প্রথাকে মানতে অনুপ্রাণিত করে। পূর্বপুরুষদের ভাল রীতি মানতে নয়।

রাসূল সাঃ এর সময়ে মক্কার লোকেরা নিজেদেরকে ইবরাহীম আঃ এর অনুসারী দাবি করতো। কিন্তু বাস্তবে তারা ইবরাহীম আঃ এর নীতি থেকে অনেক বেশি পদস্খলিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন তাদেরকে আবারও ইবরাহীম আঃ এর পথে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়া হলো, তখন তারা সেটা সহজে গ্রহণ করতে পারলো না। কারণ অন্যায় নীতিকে তারা অভ্যাস বানিয়ে সেটার গোলাম হয়ে গিয়েছিল।

মানুষের চিন্তার মতো তার শরীরও বিস্ময়কর। এই শরীরকে যে অভ্যাসেই খাপ খাওয়াতে বলেন, সেটাতে সে খাপ খাইয়ে নেয়। কেউ যদি বলে আমি ভাত খাব না। এখন থেকে সবজি খাব। আর ধীরে ধীরে সবজির পরিমাণ বাড়িয়ে একসময় ভাত খাওয়া পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়, তাহলে সেটাই তার শরীর গ্রহণ করে নেয়। এভাবে যে কোন শারীরিক কসরত আয়ত্বে আনা মানুষের পক্ষে সম্ভব। যে কোন খাবারের উপর নির্ভরশীল থাকা সম্ভব। উপোস থাকার অভ্যাস তৈরি করলে উপোস থাকার বিরল ক্ষমতাও সে অর্জন করতে পারে।

একই সাথে যোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারী প্রায় অস্তিত্বহীন

ইবনে খালদুন বলেন, "সন্তোষজনক এবং বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারী প্রায় অস্তিত্বহীন।"

অর্থাৎ একসাথে একজন বিশ্বাসী ও দক্ষ কর্মচারী পাওয়া বিরল একটি বিষয়। তবে এই না পাওয়াটা সাধারণ মানুষের জন্য। সরকার বা রাষ্ট্রীয় বড় কোন ডিপার্টমেন্ট বা বড় কোন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি হলে ভিন্ন কথা। কেন সাধারণের জন্য একসাথে দক্ষ এবং বিশ্বাসী লোক পাওয়া মুশকিল। ইবনে খালদুনের কর্মচারী বিভাজন দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো। খালদুন বলেন, "একজন কর্মচারীকে শুধুমাত্র চারটি ভাগের একটিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। যে কাজের জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সে ব্যাপারে সে দক্ষ। এবং তার কাজের ব্যাপারে সে একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। অথবা তিনি উভয় ক্ষেত্রেই বিপরীত চরিত্রের হতে পারেন। অর্থাৎ, সক্ষম বা বিশ্বাসযোগ্য কোনটিই নন। অথবা, তিনি কেবল একটি ক্ষেত্রে বিপরীত হতে পারেন। অর্থাৎ, তিনি দক্ষ হতে পারেন, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথবা বিশ্বাসযোগ্য ঠিক আছে কিন্তু দক্ষ নন।"

"প্রথমজন তথা দক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য কর্মীকে কেউ কোনোভাবেই কর্মসংস্থান দিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। তার সামর্থ্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতার কারণে তার জন্য তার চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার ব্যক্তিদের কোনো প্রয়োজন হবে না। এবং তিনি তাকে দেয়া মজুরি অবজ্ঞার সাথে গ্রহণ করবেন। কারণ, তিনি চাইলে আরও বেশি পেতে পারেন। অতএব, এই ধরনের ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আমিরদের (সরকারের) দ্বারা নিযুক্ত করা হয় যাদের উচ্চ পদমর্যাদা রয়েছে।"

"দ্বিতীয় প্রকার, এমন কর্মচারী যে সক্ষম বা বিশ্বাসযোগ্য কোনটাই নয়। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারা এমন কর্মচারী নিয়োগদান করা উচিত নয়। কারণ সে উভয় ক্ষেত্রেই তার মালিকের ক্ষতি সাধন করবে। তো দেখা যাচ্ছে, কেউই এই দুই ধরনের কর্মচারী নিয়োগদান করবে না। সুতরাং, একমাত্র জিনিস যা অবশিষ্ট আছে তা হলো অন্য দুই ধরনের কর্মচারী নিয়োগ করা। তারা হলেন, যে কর্মচারী বিশ্বস্ত কিন্তু দক্ষ নয় বা যে দক্ষ কিন্তু বিশ্বস্ত নয়।"

"এই দুই ধরনের মধ্যে কোনটি পছন্দনীয় সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে দুটি মত রয়েছে। প্রত্যেকের অনুকূলেই কিছু না কিছু আছে। তবে, দক্ষ কর্মচারী বিশ্বস্ত না হলেও পছন্দনীয়। একজন নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, তার দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না। এবং তার দ্বারা (যথাসাধ্য) প্রতারিত না হওয়ার জন্য একজন প্রহরী নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যে কর্মচারী ক্ষতির কারণ হতে পারে, এমনকি সে

নির্ভরযোগ্য হলেও, তার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির কারণে তাকে নিয়োগদান উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হবে। এটি উপলব্ধি করা উচিত। এবং সন্তোষজনক কর্মচারী খুঁজে পাওয়ার জন্য এই মানদণ্ডকে আদর্শ হিসেবে নেয়া উচিত।”

খালদুনের ভাগ করা এই বিষয়টা খুবই বাস্তব। বিশেষ করে ছোট কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য। দক্ষ, যোগ্য ও বিশ্বাসী কেউ কেন আরেকজনের অধীনে কাজ করবে। সে তো নিজেই আরেকটি প্রতিষ্ঠান খুললে ভাল করতে পারবে। আর তাই কর্মচারী খোঁজ করার সময় বিশ্বস্ত কাউকে না খোঁজাই ভালো। তাহলে দক্ষতার টান পড়বে না। অনেককে দেখা যায় বিশ্বাসী অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে নিজের পরিবারের কাউকে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিয়েছেন। কিন্তু অযোগ্যতার কারণে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে বা প্রতিষ্ঠানটি লোকসানের খাতায় নাম লিখিয়েছে।

পদবীধারী লোক দ্রুত সম্পত্তির মালিক হন। ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভ করেন

ইবনে খালদুন বলেছেন, “এমন ব্যক্তি যার কোনো পদমর্যাদা নেই, যদিও তার সম্পত্তি থেকে থাকে, তাহলে সে কেবল তার মালিকানাধীন সম্পত্তি ও তার নিজস্ব প্রচেষ্টার অনুপাতে সম্পদ অর্জন করে। অধিকাংশ ব্যবসায়ী এই শ্রেণীতে পড়েন।”

একারণে যেসকল ব্যবসায়ীদের পদমর্যাদা রয়েছে, তারা যাদের পদমর্যাদা নেই, তাদের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থানে থাকেন। ছোট-বড় কোন অফিসার যদি ব্যবসায় নামে তাহলে বিভিন্নভাবে সে অতিরিক্ত সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। বা তাকে যেচে সুবিধা দেয়া হয়। পদমর্যাদার কারণে কেউ অতিরিক্ত সুবিধা অজান্তেই পেয়ে থাকে। এটা সমাজে তার বিশ্বাসযোগ্যতার কারণে হয়ে থাকে। একজন বিশ্বাসী ও সম্মানী ব্যক্তির সাথে যে কেউ চুক্তি করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু বিপরীতে যিনি এমন সম্মান ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পরেন নি, তার পক্ষে একই পর্যায়ের চুক্তি করা সম্ভবপর হয়না। এজন্য বিষয়টা সব সময় নেতিবাচক নয়।

যেমন ধরুন, ইবনে খালদুন বলেছেন, “এর প্রমাণ হলো, যে অনেক আইনবিদ, আলেম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা যখন বেশ ভাল খ্যাতি অর্জন করেন। তখন জনসাধারণ মনে করে, তাদেরকে উপহার প্রদান করলে আল্লাহ খুশী হবেন। একারণে, লোকেরা তাদের বিভিন্ন সাংসারিক ও স্বার্থের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক হয়। এর ফলে, তারা দ্রুত ধনী হয়ে ওঠেন। যদিও তারা কোনো সম্পত্তি অর্জন করেন নি কিন্তু জনগণ যে শ্রম দিয়ে তাদের সহযোগিতা করছে, সেটার মূল্যের কারণে (এটা হয়ে থাকে)।”

এটা মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। আমরা দেখি আনেক আলেম ও বক্তার জন্য মানুষ ভালবাসা প্রকাশ করে। তাদেরকে বিভিন্ন জায়গা-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা উপহার দিয়ে। পরবর্তীতে অনেক সমালোচক এই বলে সমালোচনা করেন যে, ঐ আলেম যদি সার্বক্ষণিক ইলম চর্চা ও ওয়াজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে এসব সম্পত্তি কীভাবে অর্জন করলেন? নিশ্চয়ই তিনি সম্পত্তির লোভী। কিন্তু সমালোচকরা ইবনে খালদুনের বর্ণিত উপরোক্ত মানবিক আচরণকে আমলে না নেয়ায় এমন অযৌক্তিক সমালোচনা করে থাকেন। তাদের উচিত হবে এমন সমালোচনা থেকে নিবৃত হওয়া। তবে অবশ্যই যারা বিশেষ করে যেসব সরকারি কর্মচারিরা, নিজেদের পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন তাদের বিষয়টা ভিন্ন।

নিজেকে পারফেক্ট ভাবা একটি দোষারূপযোগ্য গুণ

ইবনে খালদুন বলেন, "(নিজের প্রতি একজন ব্যক্তির) এমন ধারণা যে তিনি পারফেক্ট এবং মানুষের অবশ্যই তার জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। এমন অহংকার এবং গর্ব একটি দোষারোপযোগ্য গুণ। যেমন, এই ধরনের ব্যক্তি হতে পারেন একজন আলেম যিনি তার সাবজেক্ট গভীরভাবে ওয়াকিফহাল। অথবা একজন লেখক যিনি খুব ভাল লেখেন। অথবা একজন কবি যিনি ভাল কবিতা লেখতে পারেন। এমন যে কেউ যিনি একটি নিদিষ্ট শিল্পে নৈপুণ্য রাখেন ধরে নেন যে, তার যা আছে তা মানুষের প্রয়োজন। অতএব তিনি তাদের প্রতি নিজের মধ্যে একধরণের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি লালন করেন।"

এভাবে একজনের মধ্যে সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তৈরি হয়। এই অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এই ব্যক্তি নিজের যে যোগ্যতার কারণে শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি লালন করছেন, এমন যোগ্যতা অন্য কেউ চেষ্টা করলে অর্জন করতে পারবেন। এজন্য এমন ভাবনা নিয়ে চলাফেরা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয় একজন ব্যক্তির ক্যারিয়ারের জন্য। মানুষের সামনে তার এমন ভাবনা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে থাকা তার সম্মান ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আজকাল খুবই দেখা যায়, একজন লেখক, ডিজাইনার বা তরুণ আলেমের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের এমন সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। তাছাড়া তার জানা উচিত, এই নির্দিষ্ট যোগ্যতার কারণে মানুষ তার কাছে আনুগত্য দিতে প্রস্তুত থাকে না। আনুগত্যের জন্য শক্তির প্রয়োজন। এই ভাবনা তাই অমূলক যে, নির্দিষ্ট এই যোগ্যতার কারণে মানুষ তাকে সর্বক্ষণিক আনুগত্য দিয়ে যাবে। বরং প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মানুষ এমন সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের শিকার লোকের কাছ থেকে ১০০ হাত দূরে চলে যাবে।

ইবনে খালদুন বলেন, "মহৎ বংশোদ্ভূত লোকেরাও এই ভ্রমের (সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স) শিকার হন। যাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ শাসক বা বিখ্যাত আলেম ছিলেন, অথবা কোনো একটি ব্যাপারে নিখুঁত ছিলেন। তারা ধরে নেয় যে, এই ধরণের লোকদের সাথে তাদের (পারিবারিক) সম্পর্ক থাকার কারণে এবং তারা তাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে তারা একই অবস্থানের দাবিদার। বস্তুত, তারা এমন কিছুকে আঁকড়ে ধরে থাকে যা অতীতের বিষয়। কারণ পরিপূর্ণতা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে আসে না। এই ধরণের ব্যক্তি আশা করে যে, সে তার সম্পর্কে যা ভাবে, লোকেরা তার সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করবে এবং যারা কোনো ক্ষেত্রে তার সাথে তার প্রত্যাশিত আচরণ করতে ব্যর্থ হয় তাদেরকে সে ঘৃণা করে। তিনি সবসময় খুব চিন্তিত থাকেন, কারণ লোকেরা তাকে তার নিজের বিবেচনায় প্রাপ্য

দিতে অস্বীকার করে। তার এই স্বভাবজাত অহমিকার কারণে একসময় মানুষ তাকে ঘৃণা করে।”

বাংলাদেশে এমন উদাহরণ খুব বেশি পাওয়া যায়। কোন বড় আলেমের সন্তান বা বড় অফিসারের, বড় কর্মকর্তার সন্তান নিজস্ব যোগ্যতা ছাড়াই পারিবারিক প্রভাবের কারণে নিজেকে স্পেশাল ভাবতে থাকেন। নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম ভাবেন। অন্যের কাছ থেকে অটোম্যাটিক সম্মান পাওয়ার আশা করেন। অথচ এটা অটোম্যাটিক নয়, বরং অর্জনের বিষয়।

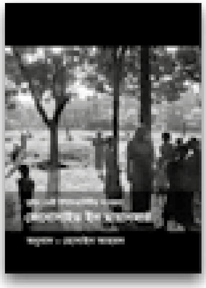

■ **জেনোসাইড ইন মায়ানমার**
মোট পৃষ্ঠা-১২৮
মূল্য-১২০টাকা
অনুবাদ- হোসাইন আহমদ।

কুইন মেরী ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল স্টেইট ক্রাইম ইনিশাটিভ (আইএসসিআই) এর একদল গবেষক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরকারের নির্যাতন ও ক্রাইমের মাত্রা জেনোসাইডের পর্যায়ের কি না তা যাচাই করে দেখেন।

আইএসসিআই এর গবেষণায় রোহিঙ্গা নির্যাতনের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং গবেষণা রিপোর্টে নির্যাতনের পদ্ধতি, চিত্র, নির্যাতনকারীদের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

এই রিপোর্টের প্রথম অংশে তুলে ধরা হয়েছে রোহিঙ্গাদের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের ইতিহাস। রিপোর্টের ২য় অংশে ডানিয়্যাল ফায়ারস্টাইন-এর জেনোসাইডের ছয় স্তরের বিবরণ অনুসারে নিপীড়নের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বারো মাস মেয়াদকালের এই গবেষনায় ২০১৫ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গা নির্যাতনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং গবেষণাটিতে ১৭৬টি ইন্টারভিউ, মাঠ পর্যায়ের অবজার্ভেশন ও ডকুমেন্টারী সূত্র সংযুক্ত হয়েছে।

■ **উইটনেস টু হরর।**
অনুবাদ- হোসাইন আহমদ

আরাকানের মন্ডুতে মায়ানমার আর্মির ধর্ষণ ও অন্যান্য নৃশংসতার ব্যাপারে একুশ জন মহিলার জবানবন্দি।

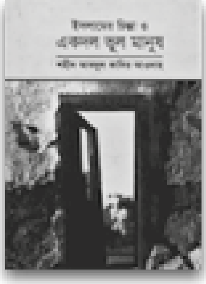

■ **ইসলামের চিন্তা ও একদল ভুল মানুষ।**
লেখক- শহীদ আব্দুল ক্বাদির আওদাহ
অনুবাদক- হোসাইন আহমদ।

লেখক ইসলামের প্রাথমিক ধারনা দিয়েছেন এই বইয়ে। সেইসব প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়, আশ্চর্যজনকভাবে সাধারণ মুসলিমরা আজ যে ব্যাপারে একেবারেই বেখবর। তাছাড়া লেখক বইয়ের শেষদিকে আলোচনা করেছেন, বর্তমানে মুসলিমদের এই দুরবস্থার জন্য কে দায়ী সেটা নিয়ে।

- **দ্য রুম হোয়ার ইট হ্যাপেনড**

লেখক- জন বোল্টন

পর্যালোচনা- হোসাইন আহমদ

মূল্য- ৭০ টাকা

প্রকাশকাল- ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

জন বোল্টন হলেন আমেরিকার সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক। আমেরিকাতে এই পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ। ট্রাম্প আমলে ৪৫৩ (২০১৮-১৯) দিন এই পদে থাকা অবস্থায় বেশিরভাগ সময়ই তিনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া রুমে অবস্থান করেছিলেন। তাই বইয়ের নাম দিয়েছেন 'দ্যা রুম হোয়ার ইট হ্যাপেনড'। অর্থ্যাত সেই রুম যাতে এসব ঘটেছিল। হোয়াইট হাউসে ব্যয় করা তার সময়কালের কাহিনী নিয়ে সাড়া জাগানো এই বইয়ের পর্যালোচনায় থাকছে, আমেরিকা ইসরাইল বন্দুত্ব, ট্রাম প্রশাসনের যুদ্ধে অনীহা, মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার, তালেবানের সাথে চুক্তি, এরদোয়ান ট্রাম্প দরকষাকষি ও আফগান ক্রাইসিস ইত্যাদি।

- **খেলাফত ও সাম্রাজ্যবাদ**

লেখক- সাদিকুর রহমান

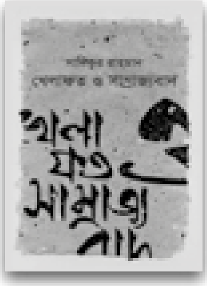

"বইটিতে মূলত স্বতন্ত্র দুটি প্রবন্ধের মাধ্যমে খেলাফত ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একেবারে মৌলিক কথাগুলো বলার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে খেলাফতের সঙ্গে খলিফা, শাসন, সুশাসন, শরিয়া, সিয়াসাতুশ শরিয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গণতন্ত্র, উপনিবেশবাদ, বি-উপনিবেশায়নসহ আরও কতগুলো বিষয় উঠে এসেছে।

সাদিকুর রাহমান সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্রকে চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন যথাযথভাবে।

ইতিহাসের নির্মোহ পর্যালোচনায়, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও সুশাসনের সমকালীন ধারণার আলোকে চিহ্নিত করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন খেলাফতে রাশেদার সুদীর্ঘ তিরিশ বছরের গৌরবময় শাসনে বাস্তবায়িত সুশাসন।

এ বিবরণের বাইরে, বইটি খেলাফত ও সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্যগুলো অতি সূক্ষ্মভাবে স্পষ্ট করতে সক্ষম হবে।

অধিকন্তু, বইটি সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করবেই'

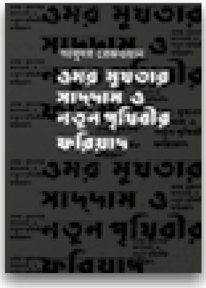

- **ওমর মুখতার, সাদ্দাম ও নতুন পৃথিবীর ফরিয়াদ**

লেখক- আবুযর রেজওয়ান

গ্রন্থটিতে লেখক নিকট-অতীত ও চলমান সময়ে দুনিয়াকাঁপানো ঘটনাগুলোকে ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ফুটে উঠেছে পৃথিবীর দেশে দেশে আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর আগ্রাসন, যুদ্ধের উন্মাদনা ও মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির কেন্দ্রীভূত কারণ।

আবুযর রেজওয়ান সন্ত্রাসবাদ ও বিশ্বরাজনীতিকে গভীরভাবে পাঠ করেছেন। বিশুদ্ধ সন্ত্রাসবাদ -সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করেছেন যথাযথ ভাবে। বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মুসলমানদের আভ্যন্তরীন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আমেরিকার তাবেদারি ও ঐক্যবদ্ধ সন্ত্রাসীদের বিপরীতে উম্মাহর অনৈক্য।

শক্তিমান চৌদ্দটি প্রবন্ধ-সমৃদ্ধ এ গ্রন্থটির শেষ প্রবন্ধে লেখক অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে শুনিয়েছেন নতুন পৃথিবীর ফরিয়াদ। ফলে বইটি একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসবিরোধী স্লোগান-ধ্বনি, উম্মাহর দরদমাখা কণ্ঠস্বর, মজলুমের আর্তনাদ, ঐক্যের সুরগাঁথা বেণু ও বাসযোগ্য পৃথিবীর আবাহন।

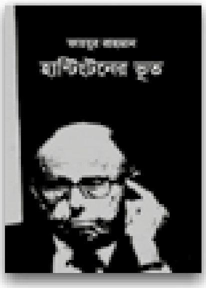

- **হান্টিংটনের ভুত।**

লেখক- ফায়জুর রহমান।

জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে পাশ্চাত্যের হাতে প্রাচ্যের যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক লাঞ্চনা ঘটেছে, তার নাম প্রাচ্যবাদ। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা বরাবরই প্রাচ্যকে খাটো করে দেখেছেন। তারা পাশ্চাত্যকে উন্নত, শ্রেষ্ঠ, যুক্তিবাদী ও মানবিক বলে অভিহিত করলেও প্রাচ্যকে চিন্তাবৈকল্যের শিকার, অনুন্নত ও অপকৃষ্ট বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

প্রফেসর স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের চিন্তায় 'ইসলাম শুধুই শত্রুসভ্যতা, মুসলমান মাত্রই খারাপ।' লেখক ফায়যুর রাহমান তার এই চিন্তাকে ভূত বলে আখ্যায়িত করে বলতে চেয়েছেন, যেসব লেখক শান্তির পক্ষে, এই ভূতকে তাড়ানো তাদের দায়িত্ব।

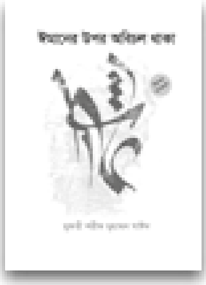

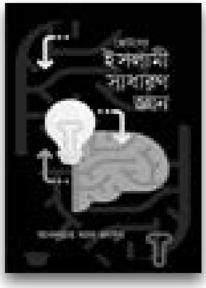

- **ঈমানের উপর অবিচল থাকা**

লেখক- মুফতি শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ

- **ইসলামি সাধারণ জ্ঞান**

লেখক- আব্দুল্লাহ আল মনসুর

নাম: হোসাইন আহমদ

পিতা: হাফিজ খবীর আহমদ বিন বশীর

আহমদ শায়েখে বাঘা রহঃ

জন্ম: ডিসেম্বর, ১৯৮৩

জন্মস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ।

স্থায়ী ঠিকানা: দক্ষিণ বাঘা,গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

বর্তমান ঠিকানা: ডকল্যান্ড, পূর্ব লন্ডন, ইউনাইটেড কিংডম।

হোসাইন আহমদ ২০০৩ সালে জামেয়া হুসাইনিয়া ইসলামিয়া গহরপুর, সিলেট থেকে দাওরাহ হাদিস এবং ২০০৪ সালে জামেয়া মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে তাখাস্‌সুস ফিল তাফসীর সম্পন্ন করেন। লেখালেখির অভ্যাস সেই ছোটবেলা থেকেই। ২০০১-২০০২ সালে জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথ সিলেট থেকে প্রকাশিত মাসিক আল-ফারুকে কাজ করেন। তিনি কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার আগ্রহ তৈরী করতে ২০০৮ সালে ইসলামিক লার্নার্স ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যা মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। ২০০৯ সালে তিনি ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসেন। ২০১৩ সালে মাসিক আল আহরার নামে একটি মাসিক ম্যাগাজিন বের করেন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কাজ করার মানসে ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে সিম্পল রিজন নামে একটি সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যা আর্তমানবতার সেবায় ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ইউরোপের হালাল ব্যাবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রতিষ্ঠা করেন ব্যবসায়ী সংগঠন “দ্য এসোসিয়েশন অব হালাল রিটেইলারস”। তার লিখিত তিনটি অনুবাদ গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে; ইসলামের চিন্তা ও একদল ভুল মানুষ, জেনোসাইড ইন মায়ানমার এবং উইটনেস টু হরর। এছাড়াও “দ্য রুম হোয়ার ইট হ্যাপেন্ড” নামে তার একটি গ্রন্থ পর্যালোচনা বের হয়েছে।

Youtube chanel
Hussain Ahmed

Website
www.theglobelaffairs.info

Ibn Khaldun Er The Muqaddimah
Hussain Ahmed
Published By: Ahrar Publishers
আহরার পাবলিশার্স